মায়াবাদের জীবনী

বা

বৈষ্ণব-বিজয়

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ-পরমহংস-স্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক বিরচিত

ভিক্ষা—৩'০০ টাকা

শ্রীধাম নবদ্বীপ, তেঘরিপাড়াস্থিত
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষে
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

অক্ষয়-তৃতীয়া, মঙ্গলবার
১৭ই মধুসূদন, ৪৮২ গৌরাব্দ
১৭ই বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
ইং ৩০।৪।১৯৬৮

প্রাপ্তিস্থান—

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**
তেঘরিপাড়া, পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঙ্গ

২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,**
চৌমাথা, পোঃ—চুঁচুড়া (হুগলী), পঃ বঙ্গ

৩। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,**
কংসটীলা (মথুরা), ইউ, পি,

৪। **শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ,**
পোঃ—গোলকগঞ্জ (গোয়ালপাড়া), আসাম

৫। **শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ,**
পোঃ—আগুতিয়াবাড় (মেদিনীপুর) পঃ বঙ্গ

৬। **শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র,**
কোরণ্ট, পোঃ—রান্দিয়াহাট (বালেশ্বর), উড়িষ্যা

৭। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ,**
পোঃ—বাসুগাঁও (গোয়ালপাড়া), আসাম

মুদ্রাকর [illegible] শ্রীরামপ্রসাদ রায়,
শ্রীগৌড়ীয়-প [illegible] পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া)।

বিষয়-সূচী

(⁄০ হইতে ॥৵০)

শ্লোক-সূত্র-মন্ত্র-ভাষ্য-টীকা-কারিকা-সূচী

পয়ার-সূচী

প্রমাণ-গ্রন্থ-তালিকা

অগ্নিপুরাণম্
অজ্ঞানবোধিনী (শ্রীশঙ্করকৃত)
অদ্বৈতবাদ-দূষণম্ (গ্রন্থকারকৃত)
অদ্বৈতমতবিমর্ষঃ (সত্যধ্যানতীর্থকৃত)
অদ্বৈতসিদ্ধিঃ (মধুসূদন সরস্বতীকৃত)
অপরোক্ষানুভূতিঃ (শ্রীশঙ্করকৃত)
অমরকোষঃ (অমরসিংহকৃত)
অমরকোষটীকা (শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত)
অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্র
অর্হৎ-দর্শনম্
আত্মপঞ্চক (শ্রীশঙ্করকৃত)
ঈশোপনিষৎ
উপনিষৎ-ভাষ্যম্ (শ্রীবলদেবকৃত)
ঐতরেয়োপনিষৎ
কূর্ম্মপুরাণম্
কৃষ্ণকর্ণামৃতম্ (শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত)
কৃষ্ণ-সংহিতা (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত)
কেবলোঽহম্ (শ্রীশঙ্করকৃত)
ক্রমসন্দর্ভঃ (শ্রীল জীবগোস্বামিকৃত)
গোবিন্দভাষ্যম্ (শ্রীল বলদেবকৃত)
গৌড়ীয়-ভাষ্য (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকৃত ভাগবত-বিবৃতি)
চৈতন্যচরিতামৃত
চৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকৃত)
চৈতন্যভাগবত
জৈবধর্ম্ম (শ্রীল ভক্তিবিনোদকৃত)
তত্ত্বকৌমুদী (বাচস্পতি মিশ্রকৃত টীকা)
তত্ত্বপ্রকাশিকা (জয়তীর্থকৃত বেদান্তের মাধ্বভাষ্য-টীকা)
তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী (গৌড়পূর্ণানন্দকৃত)
তরঙ্গিণী (ব্যাসরামকৃত ব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃতের টীকা)
ত্রিপুণ্ড্র-ধিক্কার (সত্যধ্যান তীর্থকৃত)
দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রম্ (শ্রীশঙ্করকৃত)
দশাবতার-স্তোত্রম্ (শ্রীজয়দেব-বিরচিত)
দশাবতার-স্তোত্রম্ (সংক্ষিপ্ত)
দেবী-ভাগবতম্ (অপ্রামাণিক)
নির্ণয়-সিন্ধুঃ
নির্ব্বাণ-দশকম্ (শ্রীশঙ্করকৃত)
নৃসিংহ-তাপনী
নৃসিংহ-পুরাণম্
ন্যায়দর্শনম্
ন্যায়মত-দূষণম্ (গ্রন্থকারকৃত)

ন্যায়সুধা (জয়তীর্থকৃত)
ন্যায়ামৃতম্ (ব্যাসতীর্থকৃত)
পদ্মপুরাণম্ (উত্তরখণ্ডঃ)
পারিজাত-সৌরভঃ (নিম্বাদিত্যাচার্য্য-কৃত বেদান্তভাষ্য)
পাষণ্ডমত-খণ্ডনম্ (বাদিরাজতীর্থকৃত)
পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনম্
প্রজ্ঞাপারমমিতা সূত্র
প্রমেয়রত্নাবলী (শ্রীল বলদেবকৃত)
প্রেমবিবর্ত্ত (শ্রীল জগদানন্দকৃত)
বনমালামিশ্রিয় (মধ্বসম্প্রদায়-প্রকাশিত)
বরাহপুরাণম্
বল্লভ-দিগ্বিজয়ঃ
বাধ্ব-বাস্কলি-কথোপকথন (৩।২।১৭ ব্রহ্ম-সূত্রের শারীরকভাষ্যধৃত)
বায়ুপুরাণম্
বিবেকচূড়ামণিঃ (শ্রীশঙ্করকৃত)
বিষ্ণুপুরাণম্
বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্যম্ (শ্রীল বলদেবকৃত)
বেদ
বেদান্ত-কৌস্তুভঃ (কেশবকাশ্মিরীকৃত)
বেদান্ত-বাগীশকৃত শারীরকভাষ্যের বঙ্গানুবাদ (৩।২।১৭ সূত্র)
বৈশেষিকদর্শনম্
ব্রহ্মনামাবলীমালা (শ্রীশঙ্করকৃত)
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণম্
ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যম্ (বেদান্তদর্শনম্)
ব্রহ্মানন্দীয় (ব্রহ্মানন্দকৃত)
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ
ভক্তিরসায়ন (মধুসূদন সরস্বতীকৃত)
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বক্তৃতা
ভগবদ্-গীতা
ভবিষ্য-পুরাণম্
ভাগবত
ভাগবত-টীকা (শ্রীধরস্বামি-কৃত)
ভাগবত-টীকা (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত)
ভেদোজ্জীবনম্ (ব্যাসতীর্থকৃত)
মণিমঞ্জরী (নারায়ণাচার্য্যকৃত)
মধ্ব-বিজয়ঃ (")
মাণ্ডুক্য-কারিকা (গৌড়পাদকৃত)
মাণ্ডুক্য-কারিকা-ভাষ্যম্ (শ্রীশঙ্করকৃত)
মুণ্ডকোপনিষৎ (শাঙ্কর-ভাষ্য)
যুক্তিমল্লিকা (বাদিরাজতীর্থকৃত)
যোগদর্শনম্
যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্
রামায়ণ (কৌর্ত্তিবাসকৃত)
রামায়ণম্ (বাল্মীকিকৃত)
লোকায়ত-দর্শনম্

লঘুভাগবতামৃতম্ (শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত)
লঙ্কাবতার-সূত্রম্
ললিতবিস্তারঃ
লিঙ্গ-পুরাণম্
শঙ্কর-দিগ্বিজয়ঃ
শঙ্কর-বিজয়ঃ (আনন্দগিরিকৃত)
শতসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র
শব্দকল্পদ্রুমঃ (সংস্কৃত অভিধান)
শব্দার্থ-মঞ্জরী-পরিশিষ্ট (শিবনাথ শিরোমণিকৃত)
শাক্ত-প্রমোদঃ
শারীরক-ভাষ্যম্
শ্রীমদ্ভাগবতম্
ষট্সন্দর্ভঃ (শ্রীল জীবগোস্বামিকৃত)
সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহঃ (সায়নমাধবকৃত)
সর্ব্বসম্বাদিনী (শ্রীল জীবগোস্বামিকৃত)
সাংখ্যকারিকা (গৌড়পাদকৃত)
সাংখ্য-দর্শনম্
সাংখ্য-দর্শনের ভাষ্য (বিজ্ঞান ভিক্ষুবিরচিত)
সাংখ্যমত-দূষণম্ (গ্রন্থকারকৃত)
সারঙ্গরঙ্গদাটীকা (শ্রীবলদেবকৃত)
সিদ্ধান্ত-রত্নমালা (গ্রন্থকারকৃত)
সুধা-টীপ্পনী (বাদিরাজতীর্থকৃত)
সুন্দরানন্দ-চরিতম্
সুবোধিনী (শ্রীধরস্বামিকৃত গীতা-টীকা)
স্কন্দপুরাণম্
হরিবংশঃ
হরিভক্তিবিলাসঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রবন্ধ-সূচনা

বিদ্যোৎসাহী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-সত্ত্বেও "মায়াবাদের জীবনী" গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার সুযোগ হয় নাই। কারণ কলিকাল অত্যন্ত প্রবল; তন্মধ্যে ঈশ্বর-বিরোধী নাস্তিক্য চিন্তাস্রোত, সর্ব্বোপরি আসুরিক শিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় দেশের গতিবিধি ও গবেষণা-ক্ষেত্র এত অধিক পরিমাণে নিম্নগতিতে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শাস্ত্রকর্ত্তা-শিরোমণি ভগবদবতার শ্রীশ্রীল বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে কলির অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে সত্য প্রচারে যে বিশেষ বাধা জন্মিবে, তাহা তিনি ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরাও তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। প্রথম হইতেই এই প্রবন্ধ প্রকাশে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন-অসুবিধা হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে সংক্ষেপে প্রবন্ধ-সূচনার ইতিবৃত্তি-স্বরূপ জানাইতেছি।—

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমি গৌরজন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভ করিয়া হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করি। আমার হরিকথা শ্রবণের প্রথম ভূমিকাতেই মায়াবাদের বিরুদ্ধে বহুকথা শুনিবার সুযোগ হয়। তৎপরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে **জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের** সম্পূর্ণ আনুগত্য-বুদ্ধিতে দীক্ষিত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ব্রজপত্তনে স্থায়ী-ভাবে অবস্থান করিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে

শিক্ষালাভ করি। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বহুদিন বলিয়াছেন—**"যতদিন পৃথিবীতে শঙ্কর-দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধা ভক্তির ব্যাঘাত জন্মিবে।"** সুতরাং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে। ইহা তিনি তাঁহার পত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, অনুভাষ্য, বিবৃত্তি প্রভৃতি লেখনীর মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের এই শিক্ষা আমার হৃদয়ে বিশেষ দৃঢ়তা লাভ করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছে। তদনুকূলে আমি বেদান্তদর্শনের ১০।১২ খানি বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের ভাষ্য সংগ্রহ করি। ঐগুলি আলোচনা করিয়া Cuttack Ravanshaw Collegeএ ও বহু বিদ্বৎসমাজে শঙ্কর-দর্শনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছি। বক্তৃতার সারমর্ম্ম "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" পত্রিকায়ও কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। মূলতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামভজন-শিক্ষা অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের বিচার প্রদর্শন করিয়াছি। **আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত বেদান্ত দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। 'ব্রহ্ম' বলিতে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ-স্বরূপ ব্রহ্ম নহেন। যেহেতু উক্ত শব্দত্রয় ব্রহ্মসূত্রের আনুমানিক ৫৫০ সূত্রের মধ্যে কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নহেন, নিরাকার নহেন, নিঃশক্তিক নহেন, নির্গুণও নহেন।** ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন, তবে ব্রহ্মে দয়া-গুণ কখনই থাকিতে পারে না; ইহাই নাস্তিক্য বা আসুরিক চিন্তার মূল উপাদান। শ্রীবেদব্যাস উক্ত শব্দত্রয় বেদান্তের কোনস্থলেই উল্লেখ করেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর উক্ত নাস্তিকতা ও আসুরিক চিন্তাপূর্ণ শব্দত্রয় অন্য কোথাও হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্রহ্মের স্কন্ধে অযথা চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের ব্রহ্ম প্রকৃত ব্রহ্ম নহে, উহা শূন্যেরই

ন্যায় মিথ্যা কল্পনা। ইহা জীবনী-পাঠকগণ গ্রন্থ-পাঠের মুখেই বিস্তৃত জানিতে পারিবেন।

'ব্রহ্ম' বলিতে 'শব্দব্রহ্ম'কে লক্ষ্য করে। এই শব্দব্রহ্মই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনাম-ব্রহ্ম। যাহারা এই নাম-ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না বা নামতত্ত্ব জানেন না, তাহাদের বিশুদ্ধভাবে নাম-ভজন হইতে পারে না। এইজন্যই আমি ১৯৪০ সালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিয়া 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেমধর্ম্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়' বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছি। ভগবদিচ্ছা হইলে বেদান্তের শব্দবাদ-তত্ত্বমূলক নামপর ভাষ্য প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানকালীন শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদে উক্ত মঠের পরিচালক সেবকগণের মধ্যে প্রধান সেবকসূত্রে (Manager) কাঁঠালতলার অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে (অনুমান ১৯৩৪। ১৯৩৫ সালে) দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া নিবেদন করে যে, "আপনি ত বেদান্তের পণ্ডিত, আমরা গৌড়ীয় মিশনের মুখপত্র সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়ে"র একটী বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিব; আপনি তাহাতে **'মায়াবাদ'** সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দিবেন।" আমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইয়া বলি—"আচ্ছা, একটা প্রবন্ধ দিব।" উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নামোল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না; তথাপি সত্যের খাতিরে তাহাদের এস্থলে উল্লেখ না করিলে সত্য গোপন করা হইবে। তজ্জন্য ইঙ্গিতে তাহাদের পরিচয় দিতেছি। উহাদের মধ্যে একজন 'বিদ্যাভূষণ'-উপাধিধারী ও অপর ব্যক্তি 'বিদ্যাবিনোদ'-নামে খ্যাত। যাহা হউক, ইহাদের প্রার্থনায় **"মায়াবাদের জীবনী"** রচনা করিয়াছিলাম। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কয়েক মাস পরে আসিয়া আমার নিকট হইতে প্রবন্ধটী

লইয়া গেলেন। বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইল, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই দেখিয়া উক্ত বিদ্যাবিনোদকে জিজ্ঞাসা করি—"আমার প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয় নাই দেখিলাম, ব্যাপার কি?" তখন তিনি বলেন—"প্রবন্ধটী খুব বড় হইয়া গিয়াছে, বার্ষিক সংখ্যায় স্থানাভাব হইল। সুতরাং ঐ প্রবন্ধটী গ্রন্থাকারে (Pamphlet) প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি।" আমি বলিলাম—"শ্রীল প্রভুপাদ কি এই প্রবন্ধ দেখিয়াছেন?" বিদ্যাবিনোদ তদুত্তরে বলেন—"আমি নিজেই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে শুনাইয়াছি। তিনি উহা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।" প্রবন্ধটী বিদ্যা-বিনোদের নিকটই থাকিয়া গেল।

১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর গৌড়ীয় মিশনে নানাপ্রকার গোলমাল উপস্থিত হয়। তাহাতে ৩।৪ বৎসর কাটিয়া যায়। ইতোমধ্যে মিশনের প্রয়োজীয় কাগজপত্র, দলিল-প্রবন্ধাদি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, কে কোথায় লইয়া গেল তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। আমি এই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৯৩৯ সালের জুনমাসে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে চলিয়া আসি। ১৯৪০ সালে বাগবাজার কলিকাতায় ৩৩।২, বোসপাড়া লেনস্থ ভাড়া-বাড়ীতে বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" স্থাপন করি। তৎপরে ১৯৪১ সালে ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায় (অনুমান সেপ্টেম্বর মাসে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-ক্ষেত্র কাটোয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত ত্রিদণ্ডি-যতি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ নিজমঠে ফিরিয়া আসিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতে থাকি।

পরে ১৯৪২ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপমণ্ডলের নৈর্ঋত-সীমায় চাঁপাহাটী-সমুদ্রগড়-গ্রামে

"শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মঠে" এক মাসকাল যাবৎ কার্ত্তিকব্রত পালন করিতেছিলাম। সেই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীতা শিষ্যা শ্রীযুক্তা উষালতা দেবীর গৃহে অনেকগুলি কাগজ-পত্র পাওয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে হারানিধি "মায়াবাদের জীবনী"-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি (Manuscript) প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই আনন্দিত ও উল্লসিত হইলাম।

১৯৪৩ সালে চুঁচুড়া-সহরে "শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করি। ক্রমশঃ তথা হইতে চুঁচুড়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর-সহরে মাননীয় উকিল **শ্রীযুত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী, শাস্ত্রী, এম. এ, বি.এল** মহোদয়ের সংস্কৃত টোলে ৭ দিন ভাগবত পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে তাঁহার বাড়ীতে একটা বিরাট্ লাইব্রেরী দেখিয়া বহু গ্রন্থাদি অনুসন্ধানের সুযোগ পাই। তন্মধ্যে **"লঙ্কাবতার-সূত্রম্" গ্রন্থখানি** আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি সেই গ্রন্থখানি আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইলাম। তাহার একস্থলে বর্ণিত আছে—"রাবণ ব্যোমযানে করিয়া তথাগত বুদ্ধের নিকট সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতোপরি অদ্বৈতবাদ আলোচনা করিবার জন্য যাইতেন।" "মায়াবাদের জীবনী" গ্রন্থের মধ্যে (২০ পৃঃ) এই লঙ্কাবতার-সূত্র হইতে গৃহীত প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছি। ইহা হইতেই ত্রেতাযুগের অদ্বৈতবাদিগণের ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে। এই মূলগ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ তাহার পরিচয় পাইবেন। এই সমস্ত ঘটনা বিদ্যাবিনোদকে প্রদত্ত "মায়াবাদের জীবনীর" পাণ্ডুলিপির মধ্যে ছিল না, পরে সংযোজিত হইয়াছে।

১৯৪৬ সালে কাশী-মহানগরীতে ঊর্জ্জব্রত-পালনকালে আমি বুদ্ধ-গয়ায় গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম—বুদ্ধগয়ার মন্দিরাদি প্রাচীনকাল হইতেই অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট শঙ্করাচার্য্য মোহন্তের কর্ত্তৃত্ব ও পরিচালনাধীনে রহিয়াছে। তিনিই বুদ্ধগয়ার

স্বত্বাধিকারী। ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্য মোহন্ত-মহারাজের দ্বিতলগৃহোপরি যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমি তাঁহাকে বিনয়-নম্রভাবে প্রশ্ন করিলাম—**"বুদ্ধগয়া ত' বৌদ্ধদের স্থান, আপনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য হইয়া বৌদ্ধমঠের অধিপতি হইলেন কি-প্রকারে? শঙ্কর-সম্প্রদায় কি বৌদ্ধ?"** ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন—"আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধ হইবেন কেন? বৈষ্ণবগণ আমাদের বিরুদ্ধে অযথা শ্লেষ-উক্তি করেন। আপনি **"ললিতবিস্তার"-গ্রন্থ দেখিয়াছেন?"** আমি দেখি নাই বলিয়া জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেন—"আপনি আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলোচনা করুন।" তিনি তাঁহাদের সভাপণ্ডিতকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং আমার সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে "ললিত-বিস্তার"-গ্রন্থখানি আমার হস্তে দিলেন। এই গ্রন্থের প্রমাণ মূল-গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গও বিদ্যাবিনোদকে প্রদত্ত প্রবন্ধের মধ্যে ছিল না, পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কয়েক বৎসর অতীত হইবার পর ১৯৪৯ সালে সমিতির মুখপত্র হিসাবে মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হয়। পরে উক্ত শ্রীপত্রিকার সম্পাদক পূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তি-কুশল নারসিংহ মহারাজের উৎসাহে ১৯৫৩ সালে শ্রীপত্রিকার ৫ম বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে "মায়াবাদের জীবনী" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। উহা ৫ম বর্ষের ১১টী সংখ্যা ও ৬ষ্ঠ বর্ষের ৯টী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। **ইহাই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ।**

এই প্রবন্ধটী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তি নানাপ্রকার অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও উহা বহু বাধাবিঘ্নের জন্য এতদিন যাবৎ কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। ইহার

মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, ভগবদিচ্ছাই প্রবল। কারণ বেদব্যাসের বর্ণনানুসারে কলিকাল চলিতেছে এবং কলির স্বরূপ-ধর্ম্ম এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ কলিকালকে প্রবল করিবার ইচ্ছা স্বয়ং ভগবানেরই। মানুষ আচার-বিচার ও শিক্ষায় যে কত নীচে নামিতে পারে তাহার উদাহরণ বিশ্বে থাকা প্রয়োজন। এই ইচ্ছা পূরণকল্পে ভগবান্ তাঁহার নিজসেবক শ্রীশিব বা শম্ভুকে ব্রাহ্মণগৃহে প্রেরণ করিয়া জগতে মায়াবাদ-শিক্ষা প্রচার করাইলেন। এসম্বন্ধে গ্রন্থের ১২ ও ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥

* * * * *

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

* * * * *

বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ॥

মানুষকে নাস্তিক বা আসুরিক-ভাবাপন্ন হইতে হইলে তাহাদের মস্তিষ্কের কিছু আহার প্রয়োজন। এইজন্যই শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে বৈদিকশাস্ত্রের সাহায্য লইয়া আসুরিক ধর্ম্ম ও নাস্তিকতা স্থাপন করিয়াছেন। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্বয়ং শিব বা রুদ্র সংহার-দেবতা। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা ও শিব সংহার-কর্ত্তা—এই ঐতিহ্য আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। রুদ্র কলির প্রবলতা বৃদ্ধিকল্পে আসিয়া 'জগৎ মিথ্যা', 'বিশ্ব নাই' বলিয়া সর্ব্বতোভাবে জগদ্ধ্বংসমূলক শিক্ষাই দিয়াছেন। তিনি বাহ্যতঃ জ্ঞানের আবরণে

অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচার করিয়াছেন। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়া অধঃপতিত হইয়া যাইতেছে।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনের মধ্যে যে-সকল শব্দ, সিদ্ধান্ত বা কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাই বলপূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য স্থাপন করিয়াছেন—ইহা আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। বিশেষতঃ আচার্য্য শঙ্করের জ্ঞানবাদ মৌলিক তত্ত্বহিসাবে **গৃহীত হইলেও এই 'জ্ঞান'-শব্দটী ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। তজ্জন্য 'ব্রহ্মবাদ'কে কখনও 'জ্ঞানবাদ' বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।** ইহা শুধু আমারই বক্তব্য এরূপ নহে, স্বয়ং শাণ্ডিল্য ঋষি তাঁহার "শাণ্ডিল্য-সূত্রের" দ্বিতীয় আহ্নিকের (অধ্যায়ের) শেষ সূত্র অর্থাৎ ২৬ সূত্রে ব্রহ্মকাণ্ডকে ভক্তিকাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মকাণ্ড ভক্তির নিমিত্তই হইয়াছে, জ্ঞানের জন্য নহে। ইহা দ্বারা জ্ঞানের অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

উক্ত সূত্রের আচার্য্য স্বপ্নেশ্বর বিদ্বদ্বর-বিরচিত ভাষ্য এস্থলে বিশেষ ভাবে আলোচ্য। ভাষ্য, যথা—"জ্ঞানাপ্রাধান্যে জ্ঞানকাণ্ডমিত্যুত্তরকাণ্ড-প্রসিদ্ধির্ন স্যাদিতি মন্বানং প্রত্যুচ্যতে। ভক্ত্যর্থং ব্রহ্মকাণ্ডং শ্রূয়তে ন জ্ঞানার্থম্ * * তস্মাজ্ জ্ঞানকাণ্ডমিতি ভ্রমঃ।"

এস্থলে ভাষ্যকার আচার্য্য স্বপ্নেশ্বর স্বয়ং শাণ্ডিল্য-সূত্রের শেষে তাঁহার নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে প্রমাণিত হয়, তিনি ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বিশেষ বিদ্বৎপরিবারে গৌড়মণ্ডলে রাজসেনাপতির পুত্ররূপে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আধুনিক ভাষ্যকার নহেন।

শাণ্ডিল্যঋষির পরিচয় ভারতীয় হিন্দুসমাজে শাস্ত্রজ্ঞ সকলেই অবগত আছেন। তথাপি এস্থলে তাঁহার কিছু পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক মনে করি। বেদব্যাস স্বয়ং তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্কন্দপুরাণের বহুস্থানে শাণ্ডিল্যঋষির নামোল্লেখ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণের বিষ্ণু-খণ্ডে শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যের ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—

ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতস্তু নন্দাদীনাং পুরোহিতম্।
শাণ্ডিল্যমাজুহাবাশু বজ্র-সন্দেহনুত্তয়ে ॥১৬॥
অথোটজং বিহায়াশু **শাণ্ডিল্যঃ** সমুপাগতঃ।
পূজিতো বজ্রনাভেন নিষসাদাসনোত্তমে ॥১৭॥

অর্থাৎ রাজা বিষ্ণুরাত বজ্রনাভ-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার সন্দেহ দূরীকরণজন্য নন্দগোপাদির পুরোহিত "ঋষি শাণ্ডিল্যকে" আহ্বান করিলেন। রাজার আহ্বানে "ঋষি শাণ্ডিল্য" পর্ণকুটীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর বজ্রনাভ তাঁহাকে পূজা করিয়া উপবেশনার্থ উত্তম আসন দান করিলে ঋষি তাহাতে উপবেশন করিলেন।

এতদ্ব্যতীত বেদব্যাসের গুরুদেব শ্রীনারদ-ঋষিও বিশেষ গৌরবের সহিত শাণ্ডিল্যঋষির নামোল্লেখ করিয়াছেন। নারদসূত্রের শেষদিকে ৮৩ সূত্রে শাণ্ডিল্যঋষির নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূত্রগুলি সাধারণতঃ "নারদ-ভক্তিসূত্র" বলিয়া আখ্যাত। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

"ওঁ ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ **কুমার-ব্যাস-শুক-শাণ্ডিল্য**-গর্গা বিষ্ণু-কৌণ্ডিন্য-শেষোদ্ধবারুণি-বলি-হনুমদ্বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্য্যাঃ ॥৮৩॥" —(বারাণসী হইতে ১৮০৮ শকাব্দে নাগরী হরফে মুদ্রিত ৮২ বৎসরের প্রাচীন সংস্করণ)

অর্থাৎ কুমার (সনকাদি চতুঃসন), **বেদব্যাস**, শুকদেব, **শাণ্ডিল্য**, গর্গাচার্য্য, বিষ্ণু (স্মৃতিকার ঋষি), কৌণ্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনূমান, বিভীষণাদি **ভক্তিতত্ত্বের আচার্য্যগণ** কর্তৃক ভক্তিমার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা যেন আমার এই সূত্রগ্রন্থ দর্শন করিয়া আমাকে উপহাস না করেন (দৈন্যোক্তি)। এস্থলে শ্রীনারদ ব্রহ্মসূত্র-লেখক বেদব্যাস ও শাণ্ডিল্যঋষিকে ভক্তিশাস্ত্রপ্রণেতা বলিয়া বিশেষ গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। শাণ্ডিল্যঋষিও ব্রহ্মসূত্রকে ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। **নারদ-ঋষিও ব্যাসসূত্রকে ভক্তিগ্রন্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ দিয়াছেন**। এরূপস্থলে শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানবাদ স্থাপনকল্পে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিঃশক্তিক ব্রহ্ম নিরূপণ কোনক্রমেই অনুমোদন করা যাইতে পারে না। পরিশেষে ইহাই আমার নিবেদন—যাঁহারা কলির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কখনই শঙ্কর-ভাষ্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবেন না।

আমি যে "প্রবন্ধ-সূচনা"-শেষে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের পঠন-পাঠন নিষেধ করিয়া পাঠকবর্গকে অনুরোধ জানাইয়াছি, তাহার কারণ এই যে,—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ববনাশ॥১৬৯॥

সুতরাং পরমমুক্ত-পুরুষগণের শিক্ষা ও উপদেশ অবলম্বন করিয়াই আমি মায়াবাদ আলোচনা ও পঠন-পাঠন নিষেধ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষাও আমাদের বিশেষ অনুসরণীয়।—

বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন। ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ॥
সে দুয়ের মধ্যে **বিষয়ী তবু ভাল**।
মায়াবাদী-সঙ্গ নাহি মাগি কোনকাল॥

মায়াবাদ-দোষ য'ার হৃদয়ে পশিল। কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল॥

ভক্তির স্বরূপ আর **'বিষয়', 'আশ্রয়'।**
মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয়॥

ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা-শ্রবণ-কীর্ত্তন। কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

মায়াবাদ-সম ভক্তি-প্রতিকূল নাই।
অতএব মায়াবাদী সঙ্গ নাহি চাই॥

সুতরাং আমাদের পারমার্থিক জীবন প্রস্তুত করিতে হইলে মহাজনগণের নির্দোষ শিক্ষাই একমাত্র অবলম্বন করা প্রয়োজন। বেদব্যাস জীবের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নততম মঙ্গলের চিন্তা করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম—ভক্তিসূত্র। ইহা আমি নারদ-ঋষি ও শাণ্ডিল্য-ঋষির গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনে ভক্তি বা নাম-ভজনের প্রসঙ্গ আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা বা শিক্ষা বিচার করিতে গেলে তাহা মহাজনগণের অনুমোদিত হইবে না। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ সকলেই ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, এমনকি উহা পরামুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অন্যপ্রকার পথ নানাপ্রকার দোষযুক্ত, যুক্তিহীন ও প্রমাণহীন। বিশেষতঃ মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, উহা **সিদ্ধ-সাধন-দোষযুক্ত**; এমন কি, **'বাধিতানুবৃত্তি'-দোষেও** সম্পূর্ণ দোষী। জীব যদি সত্তাহীন ব্রহ্মই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্ম হইবার জন্য পুনরায় সাধন করিবার আবশ্যকতা কি? তিনি যদি সর্ব্বক্ষণ বলিয়া বেড়ান—"অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, তজ্জন্য তাহাকে পুনরায় সাধন করিতে হইবে কেন? ইহাকেই 'সিদ্ধ-সাধন-দোষ' বলে। অদ্বৈতবাদ এই দোষে বিশেষভাবে দুষ্ট। সরল কথায় বলিতে গেলে আমার যাহা আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য কোন্ মূর্খ যত্ন করিয়া থাকে? **'বাধিতানুবৃত্তি'** আমি মূল গ্রন্থেই

আলোচনা করিয়াছি। উপসংহার-প্রসঙ্গে ১১৫ পৃষ্ঠায় "[খ] নির্ব্বাণরূপ ফল-নিরোধ" প্রসঙ্গ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান ১৯৬৮ সালে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী হইতে **শ্রীমান্ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী** (আসাম-প্রদেশবাসী) বহুযত্নে এই "মায়াবাদের জীবনী" গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। আমি তজ্জন্য তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। গ্রন্থ মুদ্রণ-বিষয়ে শ্রীমান্ ভাবভক্তি ব্রহ্মচারী ও ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছে, তজ্জন্য তাহারাও ধন্যবাদার্হ। ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** সর্ব্বতোভাবে পরিশ্রম করিয়া প্রথম সংস্করণের অর্থাৎ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় অংশের ভাষাগত পরিবর্ত্তন-যোগ্য স্থান সংশোধন করিয়াছেন এবং আমি নিজে অসুস্থ শরীর লইয়াও দেখাশুনা করিয়াছি। বিশেষতঃ গ্রন্থের নামের সহিত **"বৈষ্ণব-বিজয়" নামটী যুক্ত** করিয়াছি, কারণ উহা না করিলে সত্য গোপন থাকিয়া যায় এবং **"উপসংহার-অধ্যায়েও বহু নূতন বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি।** এসকল কার্য্যে উক্ত মহারাজ সহায়তা করায় আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমি এস্থলে "উপসংহারে" [ক] হইতে [ঝ] (১১৩ থেকে ১৪৪ পৃষ্ঠা) পর্য্যন্ত বিষয়গুলি পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

এই গ্রন্থের সূচীপত্র ও প্রবন্ধ-সূচনা-মুখে এই ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গ্রন্থের ভ্রম-সংশোধন (Proof Correction) রীতিমত না হওয়ায় বহু মুদ্রাকর প্রমাদাদি রহিয়া গিয়াছে। সে-গুলি অত্যন্ত সাধারণ বিধায় ইহাতে কোন ভ্রম-সংশোধন পত্র দেওয়া হইল না। পাঠকবর্গ সহজেই উহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। ইতি —

অক্ষয়-তৃতীয়া, মঙ্গলবার
১৭ মধুসূদন, ৪৮২ গৌরাব্দ
১৭ বৈশাখ ,১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
ইং ৩০।৪।১৯৬৮

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মায়াবাদের জীবনী

বা

বৈষ্ণব-বিজয়

জীবনী আলোচনার ধারা

"মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।"

(ব্রহ্মসূত্র-৩।২।৩ সূত্র)

জন্ম ও মৃত্যু লইয়াই জীবন। জন্ম হইতে মৃত্যুকালাবধি স্থিতি-কালের ক্রিয়া-কলাপকেই জীবনী বলে। কিন্তু বর্ত্তমান বিচার-জগতের চিন্তাস্রোতের দিকে লক্ষ্য করিতে গেলে জীবনীর সঙ্গে আরও অনেক কিছু আলোচনা করা আবশ্যক; তন্মধ্যে প্রধান—'জীবনারম্ভের পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত' ও 'জীবনান্তে সাধারণের প্রতি তাহার প্রতিক্রিয়া'। সুতরাং কাহারও বা কোনও তত্ত্বের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে উক্ত ভাব ও ধারার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। সুতরাং 'মায়াবাদের জীবনী' লিখিতে গিয়া উক্ত ভাব-ধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলে জীবনী-পাঠক সজ্জনগণ আশানুরূপ

সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। মায়াবাদ একটী তত্ত্ব। এই তত্ত্বের জীবনী লিখিতে হইলে এই তত্ত্ববাদিগণের আলোচনা করাই সুসঙ্গত। কারণ, মায়াবাদ তত্ত্ব একটি গুণ-জাতীয় পদার্থ; ইহা কাহাকেও আশ্রয় করিয়াই নিজ সত্তা প্রকাশ করে। অতএব গুণের সহিত গুণীর আলোচনা করাই যুক্তিসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে তাহাদের তুলনা-মূলক আলোচনা না করিলে, বিষয়টী কোনও প্রকারে পরিস্ফুট হইবে না। সুতরাং আমরা এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের উপরই অধিক নির্ভর করিব।

জীবনী ও ইতিহাস

যে উদ্দেশ্য লইয়া **'জীবনী'** আলোচিত হইয়া থাকে, সেই উদ্দেশ্য কতদূর পরিমাণে সফল হইবে, আমার পক্ষে তাহা বলা কঠিন। তবে ঐতিহাসিক-তত্ত্ব-মূলক জীবনী ও সাধারণ জীবনী এক নহে। ঐতিহাসিকতায় সর্ব্বপ্রকার উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়া থাকে; যাহা প্রকৃত সত্য, অর্থাৎ গুপ্ত ও ব্যক্ত সমস্ত কথাই আমাদের জানিবার সুযোগ হয়। কারণ সাধারণ জীবনী-লেখক তাঁহার নিজ অনুমোদিত অংশটুকু প্রকাশ করিয়া তৃপ্তি-বোধ করেন। পক্ষান্তরে, ইতিহাস-লেখক যাবতীয় প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া পাঠকদের চিত্তে যথাযথ তথ্যের সন্ধান জানাইয়া দেন। তাই আমি নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক সত্যতা-মূলক 'মায়াবাদের জীবনী' লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মায়া-বাদের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া তদাশ্রিত মায়া-বাদিগণের জীবনীই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছি। মায়াবাদি-গণের জীবনীর সুষ্ঠু আলোচনা করিতে হইলে অন্য মতবাদি-

গণের এবং বৈষ্ণবগণেরও প্রসঙ্গতঃ আলোচনা আসিয়া পড়ে। কারণ তুলনামূলক বিচারই বিচার। নচেৎ তাহার প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হয় না। মায়াবাদাশ্রিত মনিষীবৃন্দের মধ্যে জগদ্বরেণ্য পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করই সর্ব্বপ্রধান ও আদর্শ। সুতরাং তাঁহার জীবনী ও ক্রিয়াকলাপের উপর মায়াবাদ-জীবন অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

অনুকূল অনুশীলন

বেদান্তের "তৎ তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) সূত্র হইতে জানা যায়, তদ্বস্তু সম্যক্‌রূপ অন্বয় অর্থাৎ অনুকূল পথেই লাভ করা যায়। ধ্যতীরেক পথ বক্র ও বন্ধুর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য মুকুট-মণি শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর প্রথমেই বলিয়াছেন—"আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্",—অর্থাৎ অনুকূল ভাবেই একমাত্র কৃষ্ণের অনুশীলন করিতে হয়। সুতরাং কোনও জীবনী-তত্ত্বের অনুশীলনে অনুকুল-ভাবগ্রহণই প্রশস্ত। অনুকূল গ্রহণ করিলে প্রতিকূল-বর্জ্জন একপক্ষে যেরূপ আনুসঙ্গিক, অন্যপক্ষে সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। 'শ্রীহরিভক্তিবিসাস' বলেন "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্" (১১।৪১৭)। ভক্তির প্রতিকূলবর্জ্জন অনুকূল-অনুশীলনেরই বিশেষ অঙ্গ। আমি মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের জীবনীর সহিত বিশুদ্ধ তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা ভক্তিপথের অনুকূল বলিয়াই মনে করিয়াছি। সহৃদয় পাঠক-বর্গ ইহা ধীরভাবে পাঠ করিলে তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি দৃঢ়তর হইবে সন্দেহ নাই।

বৈদিকযুগ ও মায়াবাদ

ভারতীয় চিন্তাশীল শাস্ত্রাদিতেও সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে **'মায়াবাদ'**—এই শব্দটীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বেদ-উপনিষদাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে 'মায়াবাদ' শব্দের উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, মায়াবাদ-চিন্তার তখনও কোন হেতু বা কারণ উদ্ভব হয় নাই। যুগ সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে আর্য্য সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। বেদ অপৌরুষেয় বিধায় সৎ-সম্প্রদায়ের তাহা নিজস্ব বা স্বরূপের সম্পত্তি। কাল-সৃষ্টির পূর্ব্বে অথবা প্রাগ্-যুগে মায়াবাদ-চিন্তাস্রোতের গন্ধমাত্রও ছিল না এবং বৈদিক যুগেও তাহার সত্তা বর্ত্তমান না থাকায় তাহাকে বৈদিক-যুগীয় ধর্ম্ম বলা যায় না। বৈদিক যুগে একমাত্র বৈদিক ধর্ম্মই পালিত হইত। কোনও কোনও শাস্ত্রে মায়াবাদকে অবৈদিক বলিবার ইহাও অন্যতম হেতু বলিয়া মনে হয়।

'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই মায়াবাদিগণের অন্যতম মূলমন্ত্র। 'অদ্বয়-বাদ বা অদ্বৈতবাদ'ই মায়াবাদের অপর নাম। 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদের কতিপয় মন্ত্র সাধারণ বিচারে মায়াবাদের কথঞ্চিৎ পোষকতা করে বলিয়া কাহারও মত! যুগ-চতুষ্টয়ের পূর্ব্বে 'আমি সেই ভগবান্', 'আমিই সেই ব্রহ্ম', 'তুমিও সেই ব্রহ্ম'—এই প্রকার উক্তি জীব-স্বরূপ-পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কারণ, বেদ বলেন,—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" এই বাক্যে বহুবচনান্ত 'সূরয়ঃ' অর্থাৎ সূরিগণ তদ্বস্তু

বিষ্ণুকেই একমাত্র পরতত্ত্ব জানিয়া তাঁহার পরমপদ নিত্যকাল দর্শন বা বিচার করিয়া থাকেন। এখানে দৃশ্য বস্তু এক ও অদ্বিতীয়, এবং দর্শকের বহুত্ব ও পৃথক্ অধিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং, সনাতন সূরিগণের পক্ষে বিষ্ণুর পরম-পদের প্রতি 'সোঽহং' প্রভৃতি বাক্যসমূহের মায়াবাদ-বিচারানুরূপ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় না ; বস্তুতঃ 'সোঽহং' ইত্যাদি বাক্য জাতীয়তাবোধক।

মায়াবাদের জন্মের কারণ

জীবের যাহা নিত্য-স্বভাব বা নিত্য-স্বরূপ তাহা হইতে চ্যুত হইলেই দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইতে হয় এবং তাহা হইতে নানাপ্রকার বিপত্তির আশঙ্কা উপস্থিত হয়। বেদের সঙ্কলন-কর্ত্তা বেদব্যাস বলেন—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদ্
ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।" (ভাঃ ১১।২।৩৭)

সূরিগণের ন্যায় বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণের সদা দর্শন (অর্থাৎ তাঁহার নিত্য সেবা) হইতে বিচ্যুতিই দ্বিতীয়াভিনিবেশ এবং তাহা হইতেই মায়াগ্রস্ততারূপ ভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তখনই "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ" (চৈঃ চঃ মঃ) হইয়া পড়ে। জীবের এই বহির্ম্মুখতা-ক্রমেই মায়াবশ্যতাই ঘটে। মায়াবশ্যতাই ভোগ-বাঞ্ছা। পণ্ডিত জগদানন্দ গাহিয়াছেন—

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

জীব মায়াগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং ভোক্তৃ-অভিমানে 'কৃষ্ণ-স্বরূপে'র প্রতি লোভ

করিয়া বসে। ভগবান্ ভক্তের নিকট হইতে আনন্দ লাভ করিয়া অথবা আত্মারামহেতু পরমানন্দে মগ্ন আছেন; ভগবানের এইপ্রকার আনন্দ-ভোক্তৃত্বের একচ্ছত্র অধিকারের প্রতি ঈর্ষা-যুক্ত হইয়া জীব তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবার বাসনা করে—ইহাই অহংগ্রহ-ভাব বা পূর্ণ-বদ্ধাবস্থা। এইপ্রকার বদ্ধবস্থার বদ্ধ-ধারণা হইতেই অর্থাৎ মায়া-কবলিত হওয়ার পর হইতেই জীব মায়াবাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছে। তখন হইতেই 'সোঽহং'-বাদরূপ মায়াবাদের জন্মের কারণ উদ্ভূত হইয়াছে, লক্ষ্য করা যাইতেছে। সুতরাং ঈশ-বিমুখ জীবই মায়াশ্রয়ী অথবা মায়াবাদী হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে,—**ঈশ-ভ্রান্তি ও ঈশ-বৈমুখ্যই মায়াবাদের জন্মের মূল কারণ।**

জীব ভোগবাসনার সঙ্গে সঙ্গেই মায়িক জগতে আসিয়া পড়ে এবং মায়িকযুগ ও মায়িক কালের ভিতরে 'অস্তি-নাস্তি', 'অহং-মম', 'সৎ-অসৎ' প্রভৃতি বিচারের ভিতরে প্রবেশ করে। সত্য বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া, মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলিয়া এবং জগৎ স্বপ্নতুল্য মিথ্যা, ভ্রান্তিময় অথবা ভ্রান্তি হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং তত্ত্ব-বস্তু শক্তিহীন,—লীলাবিলাসশূন্য, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার প্রভৃতি ধারণা করিতে থাকে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটি আশ্চর্য্যের বিষয় না জানাইয়া থাকিতে পরিতেছি না। আশ্চর্য্য এই যে, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনে আনুমানিক ৫৫০ সূত্রের মধ্যে কোথাও 'নিঃশক্তিক', 'নির্ব্বিশেষ', 'নিরাকার' প্রভৃতি শব্দের আদৌ উল্লেখ নাই। তথাপী আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত

বলপূর্ব্বক স্থাপন করিতে গিয়াছেন। ইহাই মায়াবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

মায়াবাদ কাহাকে বলে ?

মায়াবাদের অপর নাম বিবর্ত্তবাদ। বেদে যে বিবর্ত্তবাদের উদাহরণ দেখা যায়, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের প্রচারিত বিবর্ত্তবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। 'দেহে আত্ম-বুদ্ধি'ই প্রকৃত বিবর্ত্ত। ব্রহ্মেতে জগৎ-ভ্রমকে প্রকৃত বৈদিকগণ বিবর্ত্ত বলেন না; কিন্তু ইহাই বর্ত্তমানে আচার্য্য শঙ্করের '**বিবর্ত্তবাদ**' বা '**মায়াবাদ**' নামেই পরিচিত। মায়াবাদের জীবনী বলিলে বিবর্ত্তবাদেরও জীবনী বুঝাইবে। প্রকৃত মায়াবাদ কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে স্থানে স্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।—

'মায়া' শব্দ সাধারণতঃ জড়া-শক্তি বা অবিদ্যা-শক্তিকে লক্ষ্য করে। ইহাই তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ-শক্তির ছায়া বা প্রতিবিম্ব। এই ছায়া-শক্তির শুদ্ধ চিজ্জগতে কোনও প্রকার প্রবেশাধিকার নাই। ইনিই জড়-জগতের অধিকর্ত্রী। জীব এই অবিদ্যা বা মায়াগ্রস্ত হইয়াই এই জড়-জগতে আসিয়া বদ্ধ হইয়া মায়াবাদ আশ্রয় করিয়াছে। মায়াবাদ বলে যে, 'মায়া' বলিয়া কোনও শক্তিই নাই। 'মায়া'-শক্তি বাদ দিয়াই ব্রহ্মের স্থিতি, তিনি নিঃশক্তিক। মায়িক যুক্তিদ্বারা ইহা স্থাপন করার চেষ্টা করায় এই তর্কপন্থিগণ 'মায়াবাদী' নামে খ্যাত। মায়িক তর্কের দ্বারা মায়াবাদী বলে যে,—'জীবই ব্রহ্ম'; কেবল মায়ার ক্রিয়াদ্বারা ব্রহ্মকে বিভিন্ন জীবরূপে দেখা যায়। পরন্তু মায়া অপগত

হইলে জীবের পৃথক্ সত্তা থাকে না। যতদিন মায়া থাকিবে, ততদিন তাহার আবরণে জীব থাকিবে। মায়ার সহিত যাহারা জীবের ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহারাই মায়াবাদী অর্থাৎ তাহারা বেদ-বেদান্ত না মানিয়া বলপূর্ব্বক মায়িক তর্কদ্বারা বলিয়া থাকেন—মায়া নষ্ট হইলে আর জীব থাকিবে না। জীবের মায়ামুক্তি বলিয়া কোনও বিশুদ্ধ অবস্থা নাই—ইহাই মায়াবাদে অপসিদ্ধান্ত-মূলক বিচার। জীবের নিত্যশুদ্ধ সত্তা বলিয়া কোনও অবস্থাই মায়াবাদে স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি, ঈশ্বরও মায়াগ্রস্ত বলিয়া মায়াবাদ স্থির করিয়া থাকে। ঈশ্বরেরও তাহা হইলে মায়ামুক্তির প্রয়োজন। সুতরাং ঈশ্বরে ও জীবে বস্তুতঃ কি পার্থক্য হইল? কেবলমাত্র কর্ম্মফলাতীতাবস্থা ও কর্ম্মফলবাধ্যতাই ঈশ্বরে-জীবে ভেদ মাত্র—হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অংশাংশী বিচার নাই। এইরূপ জানিয়া তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে গেলেই মায়াবাদ হইয়া পড়ে। জীব ও ঈশ্বর-তত্ত্বের অনুসন্ধান-ফল এইরূপ হইলে তাহা অপেক্ষা শোচনীয় সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? ইহাই তাহাদের মায়াগ্রস্ত হইবার প্রধান লক্ষণ এবং ইহা হইতে তাহারা নির্ব্বিকল্পেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। তাহাদের নির্ব্বাণ একটা মিথ্যা কাল্পনিক বাক্য মাত্র। এইরূপ নির্ব্বাণ বা নির্ব্বিকল্প মুক্তির কোনও প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত না থাকায় তাহারা বেদ-বেদান্তানুগ বিশুদ্ধ পারমার্থিক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না—ইহা ক্রমশঃ ঐতিহ্যদ্বারাই পরে প্রদর্শিত হইবে।

মায়াবাদ সম্বন্ধে ব্যাসোক্তি

বাদরায়ণ ঋষি বেদ-বিভাগ করিতে গিয়া 'ভেদ'-সূচক বাক্যের সর্ব্বতোমুখী বিবিধ প্রমাণ লক্ষ্য করিলেও 'অভেদে'র ইঙ্গিতও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বেদের ঐপ্রকার অভেদ ইঙ্গিত হইতে মায়াবাদের সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ত্রিকালজ্ঞ আচার্য্যবর্গের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে। অদ্বৈত-ভাব বেদের অসম্পূর্ণ একদেশ মাত্র। বস্তুর পূর্ণত্বের বিচার না করিয়া আংশিক বিচার করিলে তাহাকে সৎ-বিচার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরন্তু আংশিক সত্য—সত্য নহে; তাহাকে পূর্ণ-সত্যরূপে দেখাইবার চেষ্টাকে অসতী চেষ্টা বা বঞ্চনা বলা হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মায়াবাদকে তাঁহার স্বরচিত পুরাণে 'অসৎ' ও 'অবৈদিক' বলিয়া জানাইয়াছেন।—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।"

(পদ্মপুরাণ-উঃ খঃ, ২৫ অঃ, ৭ শ্লোক)

পদ্মপুরাণের বিভিন্নস্থানে, কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বভাগে ও অন্যান্য বহু পুরাণে এই মায়াবাদের ভাবী আবির্ভাবের উক্তিসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াবাদ-মত যে অবৈদিক-মত তাহাও তিনি পদ্মপুরাণে ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈদিক যুগে অর্থাৎ বেদে যে মায়াবাদ নাই, তাহা আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্তি আছে,—

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশ-কারণাৎ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থে মায়াবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"অসুরগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করতঃ দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ সরলহৃদয় জীবদিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্য-প্রযুক্ত, ঐ অসুরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে, তাহা চিন্তা করিয়া মহাদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে শম্ভো! তামস-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অসুরগণের নিকট আমার শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জৈব-জগতের মঙ্গল হইবে না। তুমি অসুর-দিগকে মোহিত করিবার জন্য এমন একটী শাস্ত্র প্রচার কর, যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশিত হয়; আসুরিক চিন্তামগ্ন জীবসকল শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সহৃদয় ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন।"

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু রুদ্রকে বলিতেছেন,—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

(পদ্ম পুঃ উঃ খঃ ৪২।১১০)

এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
তঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥

(বরাহ-পুরাণ)

[হে শম্ভো! তুমি কলিযুগে মনুষ্যাদি জীবের মধ্যে অংশ-

রূপে অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত মতে অর্থাৎ মিথ্যা নির্ম্মিত নিজ তন্ত্রাদি শাস্ত্রদ্বারা মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিত-শাস্ত্রে আমার নিত্য-ভগবৎ-স্বরূপের বিষয় গোপন করিও—তাহা দ্বারা জগতের বহির্ম্মুখ সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

আমি এইরূপ মোহসৃষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে মোহিত করিবে; হে মহাবাহো রুদ্র! তুমিও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাভুজ! অন্যায় ও ভগবৎ-স্বরূপ-প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ যুক্তিজাল প্রদর্শন কর; তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহার-মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর, আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপকে আবৃত কর।]—(ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'জৈবধর্ম্ম', ১৮শ অধ্যায়)

বিজ্ঞান ভিক্ষুর মত

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করেন, পদ্মপুরাণে ঐ প্রকার উক্তিসমূহ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ঈর্ষামূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য-যোগী বা সমন্বয়বাদী বিজ্ঞান ভিক্ষু তাঁহার 'সাংখ্য'-ভাষ্যের ভূমিকায় পদ্মপুরাণের ঐ প্রকার উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

অস্তু বা পাপিনাং জ্ঞানপ্রতিবন্ধার্থমাস্তিকদর্শনেষ্বপ্যংশতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ-ব্যবস্থাপনম্ তেষু তেষ্বংশেষ্বপ্রামাণ্যং চ। শ্রুতি-স্মৃত্যবিরুদ্ধেষু তু মুখ্যবিষয়েষু প্রামাণ্যমস্ত্যেব। অতএব পদ্ম-পুরাণে ব্রহ্মযোগদর্শনাতিরিক্তানাং দর্শনানাং নিন্দাপ্যুপপদ্যতে। যথা তত্র পার্ব্বতীং প্রতীশ্বরবাক্যম্—

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্ব্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্ ॥
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদময়ার্থতঃ।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্ ॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা ॥
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ ॥
ময়ৈব কথিতং দেবি ! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোঁকগর্হিতম্ ॥
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে ॥
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া ॥
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি ! জগতাং নাশকারণাৎ ॥

ইতি—অধিকং তু ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি।
(সাংখ্যদর্শনম্—বিজ্ঞানভিক্ষু-বিরচিত ভাষ্য)—শ্রীজীবানন্দ

বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত—২য় সংস্করণ, ভূমিকা—৫-৬ পৃঃ)

সকল দর্শনের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই বিজ্ঞান ভিক্ষুর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শঙ্করের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন না, বরং নিরপেক্ষ-ভাবে তাঁহার গুণ ও দোষ উভয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। বাস্তবদর্শী মহাজনগণ সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়াই জানেন; সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানেন না। কাহারও কল্পিত মতের দোষ প্রদর্শন করাকেই যদি ঈর্ষামূলক ব্যবহার বলিতে হয়, তাহা হইলে আচার্য্য শঙ্করও তদ্দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন না। তিনি শাক্যসিংহ বুদ্ধকে 'পাগল' আখ্যায় আখ্যাত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে—"সুগত বুদ্ধ, অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি অর্থাৎ মতিচ্ছন্নের ন্যায় প্রলাপ বকিয়াছেন"—এইরূপ বলিয়াছেন। উক্ত ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বাহ্যার্থ-বিজ্ঞান-শূন্যবাদ - ত্রয়মিতরেতর-বিরুদ্ধমুপদিশত 'সুগতেন' স্পষ্টীকৃতমাত্মনোঽসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বং।" (ব্রহ্মসূত্র—শাঙ্করভাষ্য—২।২।৩২)

সুগতের প্রতি শঙ্করের ঐ প্রকার শ্লেষ-উক্তি দেখিয়া কেহ মনে না করেন, শঙ্কর বৌদ্ধমতের বিদ্বেষকারী। সুগত-বুদ্ধের বিজ্ঞানাত্মবাদ, বাহ্যাত্মবাদ-খণ্ডনকল্পে তাঁহার যে-প্রকার চেষ্টা ও যুক্তি প্রদর্শন দেখা যায়, শূন্যবাদ নিরাসের সময় সেরূপ যত্ন পরিদৃষ্ট হয় না। শঙ্করের অন্তরে অন্তরে বুদ্ধের প্রতি ও তাঁহার শূন্যবাদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে শ্রদ্ধাই ছিল; ইহার নিদর্শন

পরে প্রদর্শিত হইবে। ব্যাসোক্তিতে জানা যায়,—আচার্য্য শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বুদ্ধের বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদ তিনি বেদের ছাঁচে ঢালিয়া ইহজগতে প্রচুরভাবে প্রচার করিয়াছেন।

বুদ্ধ সম্বন্ধে মতভেদ

শ্রীশ্রীবিষ্ণু বুদ্ধ ও শাক্যসিংহ বুদ্ধ এক নহে

পুরাণের বিভিন্ন স্থানে মায়াবাদকে বৌদ্ধমতবাদ বলিয়াও বর্ণন দেখা যাইতেছে। এক্ষণে বৌদ্ধমতবাদ সম্বন্ধেও প্রসঙ্গ-ক্রমে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধদেবের মতবাদই বৌদ্ধ-মতবাদ। সুতরাং বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও শাস্ত্রে কিরূপ বিচার আছে, তাহাও পাঠকবর্গের জানা আবশ্যক। শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী লিখিয়া-ছেন—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

তিনি অন্যত্র দশাবতার-স্তোত্রের ৯ম স্তোত্রে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

এই বুদ্ধদেব যদি বিষ্ণুই হন, তবে শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

শঙ্কর-মতবাদকে যদি বৌদ্ধ-মতবাদ বলিতে হয়, তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায় তাহার অনুসন্ধান করা দরকার। অতএব বুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধারণা, এই প্রবন্ধে তাহা কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

আচার্য্য শঙ্কর বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাও বিশুদ্ধ বিচার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিতে চাহেন—বৈষ্ণবগণের উপাস্য বুদ্ধ ও শাক্যসিংহবুদ্ধ একই। প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা নহে। পরমপূজ্য আচার্য্যকুল-শিরোমণি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—"**শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিজ্ঞানী 'জীব মাত্র'**।" সুতরাং তাঁহাকে ভগবদবতার বুদ্ধের সহিত সমান জ্ঞান করায় শাক্যসিংহ বুদ্ধের প্রতিও আচার্য্য শঙ্করের যে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, ইহা তাহারই পরিচয়। তাঁহাকে তিনি "**অসম্বদ্ধ প্রলাপকারী**" বলিয়া শ্লেষোক্তি করিলেও উহা লোক বঞ্চনার জন্য 'বাহ্যে রোষা'ভাস-প্রদর্শন মাত্র।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শঙ্কর এরূপ কথা কোথায় বলিয়াছেন, যাহা হইতে গৌতম বুদ্ধ ও আদিবুদ্ধ ভগবানকে একই বলিয়া গণ্য করিয়াছেন? উত্তরে আমি পাঠকবর্গকে শঙ্করের শারীরক ভাষ্য আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। এই সম্পর্কে আমার পূর্ব্ব প্রদর্শিত ভাষ্যধৃত-অংশে 'সুগতেন' শব্দের দ্বারা তিনি আদি বুদ্ধকে না বুঝিয়া 'শুদ্ধোদন' ও 'মায়া'-পুত্র গৌতম-বুদ্ধকেই বুঝিয়াছেন। বুদ্ধের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার

নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভষ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই —"সর্ব্বথা অপি অনাদরণীয় অয়ং সুগত-সময়ঃ শ্রেয়স্কামৈঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ।" এই বাক্যে তিনি মায়াপুত্র বুদ্ধকেই 'সুগত বুদ্ধ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। 'সময়' শব্দে সিদ্ধান্ত বুঝায়। 'সুগত-সময়' বলিলে 'সুগত-সিদ্ধান্ত' বা 'গৌতম-সিদ্ধান্ত' বুঝায়। আদি বুদ্ধ বা বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের অপর নাম 'সুগত'। এই নাম বৌদ্ধ সম্প্রদায়েই প্রচলিত আছে। 'অমরকোষ' তাহার প্রমাণ। শূন্যবাদী বৌদ্ধ অমরসিংহ এই কোষগ্রন্থের রচয়িতা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। অমরসিংহের আবির্ভাবকাল শঙ্করাবির্ভাবের ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনুমিত হয়। তিনি দ্বিজ শবরস্বামীর শূদ্রাণীর গর্ভজাত পুত্র। এই সম্পর্কে পণ্ডিত-সমাজে বহু প্রাচীনকাল হইতেই নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রচলিত আছে,—

"ব্রাহ্মণ্যামভবদ্ বরাহমিহিরো জ্যোতির্ব্বিদামগ্রণীঃ
রাজা ভর্ত্তৃহরিশ্চ বিক্রমনৃপঃ ক্ষত্রাত্মজায়ামভূৎ।
বৈশ্যায়াং হরিচন্দ্রো বৈদ্যতিলকো জাতশ্চ শঙ্কুঃ কৃতী
শূদ্রায়ামমরঃ ষড়েব শবরস্বামিদ্বিজস্যাত্মজাঃ॥

অমরকোষোক্ত দুই বুদ্ধ

অমরসিংহ বৌদ্ধধর্ম্মের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করের হস্তে পতিত হওয়ায় তিনি কেবলমাত্র তাঁহার 'কোষ-গ্রন্থ'খানি রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় গ্রন্থই দগ্ধ করিয়া ফেলেন। তাঁহার সুরক্ষিত সেই অমরকোষেই বুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আপনাদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিতেছি—

"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তামুনিঃ" (৬) "শাক্যমুনিস্তু যঃ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥" (৭)

উক্তশ্লোকে 'সর্ব্বজ্ঞঃ' হইতে 'মুনিঃ' পর্য্যন্ত ১৮টী নাম বুদ্ধ অর্থাৎ (৬) আদি বুদ্ধকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। (৭) "শাক্যমুনিস্তু" হইতে "মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ" পর্য্যন্ত শাক্যসিংহ বুদ্ধকে বুঝাইতেছে। উক্ত অষ্টাদশ নামে পরিচিত বুদ্ধ ও পরের সপ্তনামে পরিচিত বুদ্ধ কখনও এক নহেন। এই সম্পর্কে শ্রীল রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা আলোচ্য। আমি তাঁহার প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধার করিয়া পাঠকবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উক্ত শ্লোকত্রয়কে চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'মুনিঃ' পর্য্যন্ত একটী ভাগ এবং অবশিষ্টাংশ আর একটী ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বর্গবর্গে '৬' ও '৭' সংখ্যাদ্বয়ে টীকা করিয়াছেন। ৬ সংখ্যা যথা—

"মুনিঃ পর্য্যন্তম্ অষ্টাদশ বুদ্ধেঃ"

অর্থাৎ 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দ হইতে 'মুনিঃ' পর্য্যন্ত বুদ্ধবাচক। সুতরাং **সুগত-শব্দও বিষ্ণুবুদ্ধবাচক**। এবং ৭ সংখ্যার টীকা যথা—

"এতে সপ্ত শাক্যবংশাবতীর্ণে বুদ্ধমুনি বিশেষে" অর্থাৎ

'শাক্যসিংহ' শব্দ হইতে "মায়াদেবী সুতশ্চ" পর্য্যন্ত ৭টী শব্দে শাক্যবংশাবতীর্ণ শাক্যসিংহ মুনি বা বুদ্ধমুনিকে বুঝায়। উক্ত শ্লোক ও টীকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, **সুগত বুদ্ধ ও শূন্যবাদী মুনিবুদ্ধ এক নহেন**। এস্থলে পাঠকবর্গকে মাননীয় Mr. CAREY সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও Mr. H. T. COLEBROOKE মহাশয়ের ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'অমরকোষ' গ্রন্থ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। ঐ গ্রন্থের (২) ও (৩) পৃষ্ঠায় বুদ্ধ শব্দের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ২ পৃষ্ঠায় Marginal noteএ প্রথমোক্ত অষ্টাদশ নাম সম্বন্ধে "AJINA Or BHUDHA" এইরূপ লিখিত আছে এবং শেষের নাম সপ্তকের Marginal noteএ 'BUDDHA' এইরূপ লিখিত হইয়াছে এবং এই শেষোক্ত বুদ্ধ শব্দটীর (b) Foot noteএ লিখিয়াছেন, (b)The founder of the religion named from him. Mr. H. T. Colebrooke যে যে টীকা অবলম্বন করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাননীয় রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা ব্যতীত আরও পঞ্চবিংশতিটী টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না। গৌতম বুদ্ধই বাহ্যত্মবাদ ও শূন্যবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। **'সুগত'-বুদ্ধে ঐরূপ কোন নাস্তিকতা প্রকাশ পাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না**। শূন্যবাদী সিদ্ধার্থ কপিলবংশের গৌতম মুনির শিষ্য; তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম

'গৌতম'। "গুরু গোত্রাদতঃ কৌৎসাস্তে ভবন্তি স্ম গৌতমাঃ" —সুন্দরানন্দ-চরিত।

অপর বৌদ্ধ-গ্রন্থোক্ত দুই বুদ্ধ

বৌদ্ধ-শাস্ত্রে অর্থাৎ শঙ্করের আদৃত অমরকোষ ব্যতীত 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র', 'অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্র', 'শত-সাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র', 'ললিত-বিস্তার' প্রভৃতি আলোচনা করিলেও আমরা মনুষ্য-বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধ ও আদি-বুদ্ধ,—এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধের কথা জানিতে পারি। মনুষ্য-বুদ্ধ মধ্যে গৌতম একজন। ইনি জ্ঞান-লাভের পর 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধের মধ্যে 'সমন্ত-ভদ্র'কে উল্লেখ করিয়াছেন। অমরকোষ কথিত ভগবান্ বুদ্ধের অপর নাম 'সমন্ত-ভদ্র' এবং 'গৌতম' মনুষ্য-বুদ্ধ। অমরকোষোক্ত অবতার বুদ্ধের অষ্টাদশ নাম ব্যতীত উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে আরও অনেক বুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ললিতবিস্তার গ্রন্থের ২১শ অধ্যায়ে ১৭৮পৃঃ লিখিত আছে, পূর্ব্ববুদ্ধের স্থানে গৌতম -বুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিলেন।

> "এষ ধরণীমুণ্ডে পূর্ব্ববুদ্ধাসনস্থঃ"
> সমর্থ ধনুর্গৃহীত্বা শূন্য-নৈরাত্মবাণৈঃ।
> ক্লেশরিপুং নিহত্বা দৃষ্টিজালঞ্চভিত্ত্বা-
> শিব বিরজমশোকাং প্রাস্যতে বোধিমগ্র্যাং॥"

উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শাক্যবুদ্ধ পূর্ব্ব-বুদ্ধের আবির্ভাব স্থানকে তাঁহার সিদ্ধির অনুকূল হইবে মনে করিয়া সেই স্থানে একটী অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া তপস্যা

করেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম 'বুদ্ধগয়া', প্রাচীন নাম 'কীকট'। এইস্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি এখনও শঙ্করসম্প্রদায়ের গিরিসন্ন্যাসীগণের অধিনায়কত্বে সেবিত হইতেছেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, বুদ্ধগয়া স্থানটী "পূর্ব্ববুদ্ধ" বা আদিবুদ্ধ বা বিষ্ণু বুদ্ধেরই আবির্ভাব স্থান। এই স্থান শাক্যসিংহ বুদ্ধের মুক্তি লাভের উপাসনা-ক্ষেত্র মাত্র। **ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে—প্রাচীন 'অবতার-বুদ্ধ' ও বর্ত্তমান 'গৌতম বুদ্ধ' এক নহেন।**

'লঙ্কাবতারসূত্র' একখানি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক বৌদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতেও যে বুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়, তিনি এই শাক্যসিংহ বুদ্ধ নহেন। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগেই লঙ্কাধিপতি রাবণ জিনপুত্র ভগবান্ পূর্ব্ব-বুদ্ধকে এবং ভবিষ্যতেও যে যে বুদ্ধ বা বুদ্ধসুত আবির্ভূত হইবেন তাঁহাদিগকেও স্তব করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

অথ রাবণো লঙ্কাধিপতিঃ তোটকবৃত্তেনানুগায্য পুনরপি গাথাগীতেন অনুগায়তি স্ম। * * *

লঙ্কাবতারসূত্রং বৈ পূর্ব্ববুদ্ধানুবর্ণিতং।
স্মরামি পূর্ব্বকৈঃ বুদ্ধৈর্জিনপুত্রপুরস্কৃতৈঃ ॥৯॥

সূত্রমেতন্নিগছন্তে* ভগবানপি ভাষতাং।
ভবিষ্যন্ত্যনাগতে কালে বুদ্ধা বুদ্ধসুতাশ্চ যে ॥১০॥

—[লঙ্কাবতারসূত্রম্—Ist Eddn. Fasc I—by S.C: Das, C.I.F.& S.C.Acharya Vidyabhusan, M. A; M. R. A. S.; Published by the Buddhist Text

*'নিগচ্ছতে'-শুদ্ধ পাঠ হইবে।

Society of India under the patronage of Government of Bengal. Printed at the Government Press in January, 1900.]

অঞ্জনসুত বুদ্ধ ও শুদ্ধোদন বুদ্ধ পৃথক

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—আচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষা বৈষ্ণবগণই বুদ্ধের প্রতি অধিক সম্মান ও আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণবগণকেও বৌদ্ধ বলা হউক। এই স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, লিঙ্গ পুরাণোক্ত, ভবিষ্য পুরাণোক্ত, বরাহ পুরাণোক্ত দশাবতার-বর্ণনে নবম অবতার-স্বরূপ যে বুদ্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি শুদ্ধোদনের পুত্র শূন্যবাদী বুদ্ধ নহেন। বৈষ্ণবগণ শূন্যবাদীর পূজক নহেন। তাঁহারা "নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে" (শ্রীভাগবত ১০।৪০।২২) বলিয়া শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবকে অর্থাৎ বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র শ্রী শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্না'জনসুতঃ' 'কীকটেষু' ভবিষ্যতি।"

(ভাঃ ১।৩।২৪)

এই শ্লোকে যে বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি 'অঞ্জনের পুত্র,' মতান্তরে 'অজিনে'র পুত্র এবং 'কীকট নামক স্থানে অর্থাৎ গয়া প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী উহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন—

"বুদ্ধাবতারমাহ তত ইতি। অঞ্জনস্য সুতঃ। অজিতসুত ইতিপাঠে অজনিনোঽপি স এব। 'কীকটেষু' মধ্যে গয়া-প্রদেশে।"

অদ্বৈতবাদিগণ ভুলবশতঃই হউক বা যে-কোনও কারণেই হউক, শ্রীধরস্বামীপাদকে তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া জানেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি মায়াবাদিগণের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই। তিনি বলেন—অঞ্জনসুত-বুদ্ধ ভাগবত সম্প্রদায়ের পূজ্য এবং গয়া-প্রদেশে তাঁহার জন্মস্থান। কলির সম্যক্ আগমনকালে বা প্রারম্ভে তাঁহার আবির্ভাব হয়। নৃসিংহ পুরাণে ৩৬ অধ্যায়, ২৯ শ্লোকে এইরূপ আছে। যথা—

"কলৌ প্রাপ্তে যথা বুদ্ধো ভবেন্নারায়ণ-প্রভুঃ।"

ইহা হইতেও জানা যায়, ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব ন্যূনকল্পে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, জ্যোতিষের মতে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে। তাঁহার জন্মদিন সম্বন্ধে নির্ণয় সিন্ধু'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইরূপ আছে।—

"জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং বুদ্ধজন্ম ভবিষ্যতি"।

অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে বুদ্ধ-দেবের জন্ম হইবে। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র বুদ্ধের পূজা সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

"পৌষ শুক্লস্য সপ্তম্যাং কুর্য্যাৎ বুদ্ধস্য পূজনম্"।

অর্থাৎ পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বুদ্ধদেবের পূজা করিবে। বুদ্ধ সম্বন্ধে উক্ত প্রকার পূজা, নমস্কার এবং অর্চ্চন-

বিধি যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধকেই লক্ষ্য করিতেছে। বিষ্ণু-পুরাণ, অগ্নি-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের বহুস্থানে তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। দেবী-ভাগবত নামক একখানি আধুনিক গ্রন্থে ও শাক্তপ্রমোদ গ্রন্থেও জনৈক বুদ্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; তিনি শাক্যসিংহ-বুদ্ধ—বিষ্ণু-বুদ্ধ ন'ন। দেবদেবী-সেবকগণ অথবা পঞ্চোপাসকগণ শূন্যবাদী শাক্যসিংহ-বুদ্ধের যদি কোন পূজা ও সম্মানাদি করেন, তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ভাগবতগণের কিছু আসে যায় না। মোক্ষমূলার (Maxmuller) মতে শাক্যসিংহ-বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৭ (?) অব্দে কপিলাবস্তু নগরে লুম্বিনী বনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন কপিলাবস্তু নগর নেপালের নিকটবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ জনপদ। গৌতমের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়া-দেবী। ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ সত্য। অঞ্জনের পুত্র এবং শুদ্ধোদনের পুত্র—উভয় পুত্রের নাম এক হইলেও ব্যক্তিত্বে এক নহেন। একের আবির্ভাব ক্ষেত্র কীটক প্রদেশে গয়া—যাহা 'বুদ্ধগয়া' নামে প্রসিদ্ধ, অপরের জন্মস্থান কপিলাবস্তু নগর। সুতরাং বিষ্ণুবুদ্ধের আবির্ভাব স্থান ও তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি সমস্তই গৌতম-বুদ্ধের জন্মস্থান ও পিতামাতা প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ ধারণায় যাহাকে 'বুদ্ধ' বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধ ন'ন। আচার্য্য শঙ্করের এ সম্বন্ধে যে বিচার তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। অবশ্য

ঐতিহ্যমূলক বিচারের মধ্যে এইরূপ মতভেদ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। তথাপি গুরুতর বিষয় লইয়া নিরপেক্ষ আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বুদ্ধের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন একপ্রকার এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত ও বিচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি পূজা ও সম্মান জ্ঞাপন অন্য প্রকার। সে যাহা হউক, আমার বিশ্বাস—পাঠকবর্গ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বুদ্ধ একজন নহেন—ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন হইল। শাক্যসিংহ বুদ্ধ ও অবতার বুদ্ধ সম্পূর্ণ পৃথক্। যদিও উভয়ের মধ্যে কোনও কোনও অংশে হয়ত সাম্যও ছিল, তথাপি এক বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না।

আচার্য্য শঙ্করের বৌদ্ধত্ব

বৌদ্ধ মতেও শঙ্কর বৌদ্ধ

বৌদ্ধ-মতাবলম্বী কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রকাশিত "প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে"র—১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"**বৌদ্ধের এই 'শূন্য', হিন্দুর (শঙ্করের) 'ব্রহ্ম' ভিন্ন নয়। অতএব বৌদ্ধের 'শূন্যবাদ'ও (শাঙ্কর) হিন্দুর 'ব্রহ্মবাদ' একার্থ-প্রতিপাদক বিভিন্ন শব্দ মাত্র**"। তিনি যে একজন প্রধান বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। আচার্য্য শঙ্করের মত ও বুদ্ধের মত যে একই, তাহা তিনি উক্ত গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু-প্রমুখ সাংখ্য-দার্শনিকগণ, পাতঞ্জল-দার্শনিক যোগিগণ, বেদান্ত-দার্শনিক শ্রীল রামানুজ, শ্রীল মধ্ব, শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীবল্লভাচার্য্য,

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণ, এমন কি বৌদ্ধগণও শঙ্করকে বুদ্ধ-চিন্তাস্রোতের পরিপোষকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর স্বয়ংও আমার পূর্ব্ব-প্রদর্শিত যুক্তি-অনুসারে বুদ্ধের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। **বিবিধ পুরাণে শঙ্কর-বাদকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।** পুরাণোক্তিসমূহ অকাট্য বলিয়া শাঙ্করগণের অনেকে ঐ শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কপট যুক্তি প্রদর্শন করিতে চাহেন। বাস্তবিক উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বৌদ্ধ ও শাঙ্কর সিদ্ধান্তের ঐক্য

ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া নানা প্রকারে আমরা শঙ্কর-মত ও বৌদ্ধ-মতের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি। কেবল ঐতিহ্যের দ্বারা তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করিলে মায়া-বাদিগণের হয়ত আপত্তি হইতে পারে। তাঁহাদের আপত্তি দূরীকরণ ও সন্তোষ বিধানার্থ শঙ্কর-সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া উভয়ের ঐক্য প্রদর্শন করিতেছি। **'মায়াবাদের জীবন'** কোন্ শ্রেণীর চিন্তাস্রোতে কি-প্রকারে পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে পাঠকবর্গকে আমার নিবেদন করিবার বিষয়। প্রকৃতিই মায়া অথবা মায়ার অঙ্গ। সুতরাং বুদ্ধের প্রকৃতিবাদকেও মায়াবাদ বলিলে বিশেষ কোন পার্থক্য হয় না। 'বুধ্' ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত'—বুদ্ধ। বুধ্ ধাতুর অর্থে বোধ বা জ্ঞানকে লক্ষ্য করে। 'মায়া'-গর্ভে যে-বুদ্ধ অর্থাৎ যে-জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহাকেও মায়াবাদ বলে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌতমের আবির্ভাবের পর হইতেই মায়াবাদ একটী বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া জগতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। **বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বকার অদ্বৈতবাদ, এবং আধুনিক বুদ্ধ ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ (মায়াবাদ) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।** সে যাহা হউক, এস্থলে শাঙ্কর ও বৌদ্ধমতের ঐক্য প্রদর্শনই আমাদের কর্ত্তব্য। সুতরাং 'জগৎ', 'ব্রহ্ম', 'শূন্য', 'মোক্ষের উপায়', 'ব্রহ্ম ও শূন্যের একত্ব' প্রভৃতি সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও শঙ্করের মতের মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই, নিম্নে ইহা দেখাইতেছি।

বৌদ্ধ মতে জগৎ মিথ্যা

বৌদ্ধমতে জগৎ একটী শূন্য তত্ত্ব। জগতের আদি 'অসৎ' অর্থাৎ 'শূন্য', অন্তও অসৎ-স্বরূপ শূন্য। যাহার আদ্যন্ত অসৎ বা শূন্য, তাহার মধ্যও শূন্য ও অসৎ। কাল বলিয়া কোনও কিছু তন্মতে স্বীকৃত হয় নাই। শূন্যই আদি, শূন্যই অন্ত। 'অতীত' শূন্য, 'ভবিষ্যৎও' শূন্য এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী 'বর্ত্তমানও' শূন্য। তিনি বলেন,—'বর্ত্তমান' বলিয়া কোনও কাল নাই,—উহা অতীত এবং ভবিষ্যতেরই নামান্তর। কোনও বাক্য বলিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা 'ভবিষ্যৎ' এবং উহা উচ্চারিত হইবামাত্রই 'অতীত'। সুতরাং 'বর্ত্তমান' বলিয়া কোনও কাল খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধগণ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ জগতও সুতরাং নাই। আমরা বলি—'রাম জীবিত আছে' বলিলে কি রামের অস্তিত্ব প্রমাণ হইবে না? রাম নামে কোনও ব্যক্তি কি নাই—বলিতে হইবে? তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের অস্বীকারকারী যুক্তি-প্রদাতা বর্ত্তমান

থাকিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা কি অস্বীকার করিতে হইবে? প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ত্তমান-কাল আছে বলিয়াই 'ভূত' ও 'ভবিষ্যৎ' কালের সত্তা উপলব্ধ হইয়া থাকে। যাহা হউক, বেদ্ধমতে জগতের ত্রিকাল-মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। আচার্য্য শঙ্করও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন—পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

শঙ্করমতেও জগৎ মিথ্যা

আচার্য্য শঙ্করও বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জগতের কারণ ত্রিকালশূন্য-স্বরূপ একটী তত্ত্বকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার নাম অবিদ্যা। **এই অবিদ্যা একটী সদসদ্-বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব**। শ্রীশঙ্কর তাঁহার 'অজ্ঞানবোধিনী'-গ্রন্থে জগৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। উহার অষ্টম বাক্য, যথা—

"ভো ভগবান্! যদ্ **ভ্রমমাত্রসিদ্ধং তৎ কিং সত্যম্?** অরে যথা **ইন্দ্রজালং** পশ্যতি জনঃ, ব্যাঘ্রজলতড়াদি অসত্যতয়া প্রতিভাতি কিম্? ইন্দ্রজালভ্রমে নিবৃত্তে সতি **সর্ব্বং মিথ্যেতি** জানাতি। ইদন্তু সর্ব্বেষামনুভবসিদ্ধম্।"

উক্ত বাক্যে তিনি জগৎকে ভ্রমমাত্র এবং ইন্দ্রজালের ন্যায় সর্ব্বেব মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। নির্ব্বাণ-দশকের ৬ষ্ঠ শ্লোকেও "ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্নকো বা সুষুপ্তির্ন বিশ্বে।" ইত্যাদি বাক্যে শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধের ন্যায় বিশ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যং
সত্যজ্ঞানানন্দরূপেণ বিমোহাৎ।
নিদ্রামহাৎ **স্বপ্নবৎ তন্ন সত্যং**
শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহম্ ॥"
(শঙ্কর-কৃত আত্মপঞ্চক—৩য় শ্লোক)

অর্থাৎ 'তন্ন সতং স্বপ্নবৎ'—বিশ্ব সত্য নহে, অসৎ এবং স্বপ্নতুল্য অলীক। বিশ্বের অস্তিত্ব নিদ্রাকালের স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে।

বুদ্ধ বিশ্বকে 'সংস্কার' বিশেষ বলিয়া কোথাও কোথাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। শঙ্কর উহা 'স্বপ্নের' মত প্রতিভাত হয় মাত্র,—এইরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ 'সংস্কার' ও 'স্বপ্ন' একই ধারণা-জ্ঞাপক; কারণ 'সংস্কার' ও 'স্বপ্ন' উভয়ই কল্পনা হইতে উদ্ভূত হয়। যেখানে অকল্পিত বস্তু স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, সেখানেও সংস্কারই তাহার মূল কারণ। ইহাই দার্শনিকগণের মত। শঙ্কর যদিও বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে বৌদ্ধের 'সংস্কার-বাদের' প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন, তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার স্বপ্নতুল্য জগৎ-প্রতীতি ও সংস্কার-বাদ একই বলিয়া কথিত হয়—কেবল ভাষান্তর মাত্র।

আচার্য্য শঙ্কর জগৎ-কারণরূপা অবিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়া **'সদসৎ-বিলক্ষণ-অনির্ব্বচনীয়ত্বের'** কথা যে-ভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধের ত্রিকালশূন্যত্বের সহিত কিছু মাত্র ভেদ হয় না। শুক্তি ও রজতের দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি বলেন, রজত-জ্ঞান অবিদ্যা

বা অজ্ঞানোৎপন্ন। সুতরাং এই রজত-জ্ঞান প্রাতিভাসিক মাত্র। প্রাতিভাসিক বস্তু তাবৎকাল স্থায়ী; বৌদ্ধমতে ইহা ক্ষণিকমাত্র। অর্থাৎ রজতের তাৎকালিক জ্ঞান, অজ্ঞান মাত্র। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে উহার অস্তিত্ব না থাকায়, উক্ত অজ্ঞান বা অবিদ্যা সৎ নহে, মিথ্যা মাত্র। 'অদ্বৈত সিদ্ধি' প্রকাশক মাননীয় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আচার্য্য শঙ্করের মত ব্যক্ত করিতে গিয়া আশ্চর্য্যজনক বাক্যের আবাহন করিয়াছেন, যথা—

"যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা প্রতিভাত হয়, যেমন জগৎ; এবং যাহার অস্তিত্ব আছে তাহা প্রতিভাত হয় না, যেমন ব্রহ্ম।" উক্ত বাক্য বৌদ্ধমতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। বৌদ্ধ জ্ঞানশ্রী বলেন, "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্" অর্থাৎ যাহা সৎ বা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই ক্ষণিক বা তাৎকালিক, সুতরাং মিথ্যা। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার 'অপরোক্ষানুভূতি'-গ্রন্থের ৪৪ শ্লোকে বুদ্ধের ক্ষণিকবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"রজ্জুজ্ঞানাৎ **ক্ষণেনৈব** যদ্বদ্ রজ্জুর্হি সর্পিনী।"

অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমের দ্বারা যে অনুভূতি হয়, **তাহা ভ্রান্তিময় হইলেও ক্ষণিক**। সুতারাং **জগৎরূপ যে ভ্রান্তি, তাহাও ক্ষণিক**। জগতের ত্রৈকালিক সত্য-শূন্যত্বের তাৎকালিকতা স্বীকার করিলে বুদ্ধের জগদ্ব্যাপারে আদ্যন্ত অসৎরূপ বিশ্বের ত্রিকালশূন্য ক্ষণিকত্বের সহিত কি তফাৎ হইল? সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন।

ব্রহ্ম ও শূন্য

জগদ্-ব্যাপারে বুদ্ধ ও শঙ্কর যে একই সিদ্ধান্ত কয়িয়াছেন, পাঠকবর্গকে নিবেদন করিয়াছি। জগৎ যদি অস্তিত্বহীন, মিথ্যা অথচ ক্ষণিক ও প্রাতিভাসিক হয়, তাহা হইতে সৎ ও নিত্য বস্তু কি?—তাহাই বর্ত্তমানে বিচার্য্য। অদ্বয়বাদী বুদ্ধের শূন্যই তাঁহার সৎ ও নিত্য—অর্থাৎ শূন্যজ্ঞানই চরমজ্ঞান। আর ব্রহ্মবাদী শঙ্করের ব্রহ্মই সৎ ও নিত্য—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই চরমজ্ঞান।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শঙ্করমতে **'যাহার প্রতীতি নাই তাহাই সৎ'**। এবং বুদ্ধও প্রতীতিহীন বস্তুকে **শূন্য** বা **সৎ** বলিয়া জানাইয়াছেন। শঙ্কর উহাকে 'ব্রহ্ম'-শব্দের দ্বারা বুঝাইতে গিয়া শূন্য হইতে অধিক কি বস্তু জানাইলেন?—পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। আমার মতে—**শূন্যের ধারণা ষোলআনাই বজায় রাখিয়া তিনি 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা 'শূন্য'-শব্দকে ভাষান্তরিত করিলেন মাত্র**। 'শূন্য'-সম্বন্ধে বৌদ্ধগণ যে-কিছু ব্যক্ত করিয়া থাকেন, শঙ্করও 'ব্রহ্ম'-সম্বন্ধে তাহাই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সুতরাং শূন্য ও ব্রহ্মে কোনওরূপ পার্থক্য হইতেছে না। আমরা দুই একটী প্রমাণ উদ্ধার করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তের আরও দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছি।

বুদ্ধের শূন্যবাদ

প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের (বৌদ্ধগণের একটী প্রামাণিক গ্রন্থ) ষোড়শ সূত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়, যথা—

"সুদুর্ব্বোধাসি মায়েব দৃশ্যসে ন চ দৃশ্যসে।"

অর্থাৎ, তুমি অতিশয় দুর্ব্বোধ এবং মায়ার ন্যায় কখনও দৃষ্ট হও, কখও দৃষ্ট হও না।

উক্ত গ্রন্থে দ্বিতীয় সূত্রে—

"আকাশমিব নির্লেপাং নিষ্প্রপঞ্চাং নিরক্ষরাম্। যস্তাং পশ্যতি ভাবেন স পশ্যতি তথাগতম্।"

অর্থাৎ, যে তোমাকে আকাশের ন্যায় অর্থাৎ শূন্যতুল্য নির্লেপ, নিষ্প্রপঞ্চ ও নিরক্ষরভাবে দর্শন করে, সেই 'তথাগত' অর্থাৎ শূন্যত্বকে প্রাপ্ত হয়।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার দ্বিতীয় বিবর্ত্তে এইরূপ আছে,—

"সর্ব্বধর্ম্মা অপি দেবপুত্রা মায়োপমাঃ স্বপ্নোপমাঃ * * * প্রত্যক্-বুদ্ধোঽপি মায়োপমঃ স্বপ্নোপমঃ। প্রত্যকবুদ্ধত্বমপি মায়োপমং স্বপ্নোপমম্। সম্যক্ সম্বুদ্ধোঽপি মায়োপমঃ স্বপ্নোপমঃ। সম্যক্ সম্বুদ্ধত্বমপি মায়োপমং স্বপ্নোপমম্।"

অর্থাৎ,—সুগতবুদ্ধ দেবপুত্রগণকে কহিতেছেন,—সমস্ত ধর্ম্মই মায়েপম ও স্বপ্নোপম। প্রত্যক্ বুদ্ধ সম্যক্ সম্বুদ্ধ এবং তৎ-তৎ-ধর্ম্মসকলই স্বপ্নোপম ও মায়োপম।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে সায়নমাধব বৌদ্ধদর্শন-বর্ণন-প্রসঙ্গে পঞ্চদশ বাক্যে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"মাধ্যমিকাস্তাবদুত্তমপ্রজ্ঞা ইত্থমচীকথন্। ভিক্ষুপাদ প্রসারণ-ন্যায়েন ক্ষণভঙ্গাদ্যভিধানমুখেন স্থায়িত্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগত সর্ব্ব-সত্যত্বভ্রমব্যাবর্ত্তনেন সর্ব্বশূন্যতায়ামেব পর্য্যবসানম্। অতস্তত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যমেব।"

অর্থাৎ, উত্তমপ্রাজ্ঞ মাধ্যমিকেরাই এইরূপ কহিতেছেন। প্রপঞ্চের ক্ষণভঙ্গাদি অর্থাৎ সংস্কারগত ক্ষণিক অভিধানমুখে যে স্থায়িত্বানুকুলবেদনীয়ত্বানুগত সকল সত্যতাই ভ্রমব্যবর্ত্তন-হেতু সর্ব্বশূন্যতায়ই পর্য্যবসান লাভ করিতেছে। **অতএব সৎ ও অসৎ উভয়েই উভয়াত্মক চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত শূন্যতত্ত্ব।**

উক্ত গ্রন্থের ২৯ সংখ্যার বাক্যেও শূন্য সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

"কেচন বৌদ্ধা বাহ্যেষু গন্ধাদিষু আন্তরেষু রূপাদি-স্কন্ধেষু সৎস্বাপি তত্রানাস্থামুৎপাদয়িতুং সর্ব্বং শূন্যমিতি প্রাথমিকান্ বিনেয়ানচীকথৎ।"

অর্থাৎ, কোন কোন বৌদ্ধমতাবলম্বীরা বাহ্যবস্তু গন্ধ, আন্তরিক ও রূপাদি স্কন্ধে, এমন কি 'সৎ'এও অনাস্থা উৎপাদনের নিমিত্ত সকল শূন্য, ইহা প্রাথমিকগণকে বলিয়াছেন।

শাক্যসিংহ বুদ্ধের বিবরণ প্রসঙ্গেও ললিতবিস্তারের (বৌদ্ধগ্রন্থ) ২১শ অধ্যায়ে শাক্যসিংহ বুদ্ধ 'শূন্য' ও 'নৈরাত্মবাদ'-ধনুকের দ্বারা সংসারিক ক্লেশ-রিপুর বিনাশ করিয়াছেন।— এইরূপ উক্তি আছে। সমর্থঃ ধনুর্গৃহীত্বা শূন্য-নৈরাত্মবাদিনৈঃ ক্লেশরিপুন্ নিহত্বা" ইত্যাদি। উপরিউক্ত বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির প্রমাণসমূহ হইতে জানা যায়, মহানির্ব্বাণরূপ শূন্যবস্তু আকাশের ন্যায় নিরক্ষর নিষ্প্রপঞ্চ এবং যাহা প্রপঞ্চ অর্থাৎ কারণরূপ শূন্যের কার্য্য বা ধর্ম্মজ্ঞাপক, তৎসমুদয়ই শূন্য এবং স্বপ্নোপম, মায়োপম। প্রপঞ্চ ক্ষণিক হইলেও ইহার মূল কারণ 'শূন্য'। প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রে বলা হইয়াছে,—আম্রের আম্রত্বগুণসমূহ অপহৃত হইলে

উহা **শূন্যেই পর্য্যবসিত হয়।** শঙ্করের নির্গুণব্রহ্মবাদ ইহারই নামান্তর। বুদ্ধ বলেন,—**যাহাতে গুণ নাই বা কার্য্য নাই, তাহাই শূন্য। শঙ্করও বলেন,—যাহাতে গুণ নাই, তাহাই ব্রহ্ম।**

শঙ্করের ব্রহ্মবাদ

এক্ষণে বুদ্ধের শূন্যবাদের সহিত আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মবাদের ঐক্য প্রদর্শিত হইতেছে। সুতরাং উল্লিখিত প্রমাণগুলির সহিত তুলনা করিয়া পাঠ করিতে হইবে। **অপরোক্ষানুভূতিতে** ৪৫ শ্লোকে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—

উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোন্য ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ॥

৪৯ শ্লোকে ঃ—

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ॥

৯৪ শ্লোকে ঃ—

উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব দৃশ্যতে।
অজ্ঞানঞ্চেতি বেদান্তাস্তন্নষ্টৈব কা বিশ্বতা॥

অর্থাৎ, প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্মব্যতীত ইতর কোন বস্তুই নহে (৪৫)। পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেই ভূতসমূহ জাত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত (প্রপঞ্চভূত) ভেদসমূহ ব্রহ্মই, এইরূপ নিরূপণ করিবে (৪৯)। যে-প্রকার মাটীর পাত্রের উপাদান জল-মৃত্তিকাদি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইপ্রকার প্রপঞ্চের উপাদান অজ্ঞান। বেদান্তে (?) আছে, সেই অজ্ঞান নষ্ট

হইলে বিশ্বত্ব অর্থাৎ প্রপঞ্চত্ব কোথায় (৯৪)? অতএব দেখা যাইতেছে, শঙ্করমতে ব্রহ্ম জগতের মূল কারণ। ব্রহ্ম হইতেই সমগ্র ভূতসকলের উৎপত্তি। ব্রহ্মই অজ্ঞানহেতু জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই 'হেতু'র অর্থাৎ অজ্ঞানের বিনাশ বা অপনোদন হইলেই দৃশ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইবে। বিশ্বই দ্বৈতোৎপত্তিরূপ ভয়-ক্লেশাদির আকর।

বুদ্ধ শূন্যবাদ-রূপ অস্ত্রদ্বারা বিশ্বক্লেশ বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং শঙ্করও ব্রহ্মবাদ-রূপ অস্ত্রদ্বারা বিশ্বক্লেশ ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সংসার-ক্লেশ নিবারণের হেতুভূত ব্রহ্মত্ব যেরূপ, শূন্যও সেরূপ; এবং জগৎ-প্রতীতি নষ্ট হইলে একের শূন্য, অপরের ব্রহ্ম থাকিবে। এক্ষণে জগৎ-প্রতীতি বিনষ্ট করিয়া দিবার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও শাঙ্করগণের পরস্পরের কি বিচার, তাহার সামান্যতঃ আলোচনা আবশ্যক। এবং উভয় মতের ঐক্য কোথায়, তাহাও প্রদর্শন করা দরকার।

বৌদ্ধমতে মোক্ষোপায়

মোক্ষের উপায় বিচারে অর্থাৎ জগৎ বিনাশের চেষ্টায় বৌদ্ধগণ বলেন,—

"তৎ দ্বিবিধং তদিদং সর্ব্বং দুঃখং দুঃখায়তনং দুঃখসাধনঞ্চেতি ভাবয়িত্বা তন্নিরোধোপায়ং তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ। অতএবোক্তং দুঃখ-সমুদায়-নিরোধ-মার্গাশ্চত্বারঃ আর্য্যস্য বুদ্ধাভিমতানি তত্ত্বানি। তত্র দুঃখং প্রসিদ্ধং সমুদায় দুঃখ-কারণং তদ্দ্বিবিধং প্রত্যয়োপ-নিবন্ধনো হেতুপনিবন্ধনশ্চ।" — সায়নমাধব

এই সমুদয় (বিশ্ব) দুঃখময়, দুঃখায়তন এবং দুঃখদায়ক— এইরূপ ভাবিয়া তাহার নিরোধের উপায়-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনে যত্ন করিবে। অতএব কথিত আছে যে, দুঃখ-সমুদয়ের নিরোধের ৪টী মার্গ আছে। কিন্তু আর্য্য বুদ্ধের অভিমতে তত্ত্বসকলই উক্ত দুঃখ নিরোধের মার্গ। দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা প্রসিদ্ধই আছে অর্থাৎ উহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু সমুদয় দুখের কারণই 'বিশ্ব' এবং এইকারণ দুই প্রকার যথাঃ— প্রত্যয়োপনিবন্ধন ও হেতূপনিবন্ধন।

প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের ১৭ সূত্রে এইরূপ আছে,—"মার্গস্তমেকো মোক্ষস্য নাস্তন্য ইতি নিশ্চয়ঃ" অর্থাৎ প্রজ্ঞাপারমিতাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার স্তবে বলিতেছেন—তুমি একমাত্র মোক্ষমার্গ অন্য কেহ নহে; ইহাই নিশ্চিত।

বৌদ্ধ মহাযানীয় শাখার বহুগ্রন্থে প্রজ্ঞাপারমিতাকে মোক্ষের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রারম্ভেই এইরূপ লিখিত আছে যে,—

"নৈব তেন বিনা মোক্ষং তস্মাৎ শ্রোতব্যং আদরাৎ।"

অর্থাৎ প্রজ্ঞাপারমিতা ব্যতীত মুক্তি নাই। সেইহেতু আদরের সহিত তাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্রও উক্ত বাক্যের পৃষ্ঠপোষকতা আছে। যথা—

"যা সর্ব্বজ্ঞতয়া নয়ত্যুপসমং শন্ত্যৈশিণঃ শ্রাবকান্।
যা মার্গজ্ঞতয়া জগদ্ধিতকৃপ লোকার্থসম্পাদিকা॥

সর্ব্বকারমিদং বদন্তি মুনয়ো বিশ্বং যয়া সঙ্গতা।
তস্মৈ শ্রাবক-বোধিসত্ত্বগণিনো বুদ্ধস্থ মাত্রে নমঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় সর্ব্বজ্ঞতা আসে, সেই প্রজ্ঞাপারমিতা শান্তিকামী শ্রাবকদিগের সমস্ত সংসারক্লেশ উপশম করেন। তিনি জানেন যে, কোন্ পথে গেলে মোক্ষ পাইবে। সুতরাং তিনিই জগতের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। সেই শ্রাবক-বোধিতত্ত্ব বুদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতাকে নমস্কার করিতেছি।

উক্ত বৌদ্ধ-শাস্ত্রের প্রমাণসমূহের দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, মোক্ষ অর্থাৎ শূন্যত্ব লাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান বা প্রজ্ঞাপারমিতা। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' বলিতে বৌদ্ধগণ যাহা বলেন, তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের ১ম সূত্রে প্রজ্ঞা-পারমিতার স্বরূপ-নির্ণয়ে এইরূপ লিখিয়াছে,—

"নির্ব্বিকল্পে নমস্তুভ্যং প্রজ্ঞাপারমিতেঽমিতে।
যা ত্বং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গি নিরবদ্যৈর্নিরীক্ষসে॥"

অর্থাৎ, হে প্রজ্ঞাপারমিতে! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি নির্ব্বিকল্প ও অমিত। তোমার সকল অঙ্গ অনবদ্য অর্থাৎ নির্দ্দোষ। সুতরাং যাঁহারা নির্দ্দোষ তাহারাই তোমাকে দেখিতে সমর্থ হন।

উক্ত শ্লোকের প্রত্যেক শব্দ লইয়া বিচার করিলে শঙ্কর ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রজ্ঞা-পারমিতার সহিত একই বলিয়া মনে হইবে। বৌদ্ধরা আরও বলেন, সংসার-ক্লেশের পূর্ব্বোক্ত 'প্রত্যয়োনিবন্ধন' ও 'হেতূ-পনিবন্ধন' কারণদ্বয়ের নিরোধ করিলে মুক্তি হইবে।

"তদুভয়নিরোধকরণান্তরং বিমলোজ্ঞানোদয়ো বা মুক্তি তান্নিরোধোপায়োমার্গঃ স চ তত্ত্বজ্ঞানং তচ্চ প্রাচীনভাবনাবলাদ্ভবতীতি পরমং রহস্যম্।"—(সায়নমাধব)

অর্থাৎ উক্ত উভয় কারণের নিরোধ হওয়ার পর বিমল-জ্ঞানের উদয় বা মুক্তি হয়। যিনি উক্ত কারণদ্বয়ের নিরোধ করিতে পারেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। প্রাচীন ভাবনা-বলেই উক্ত তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞাপারমিতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই অতি পরম রহস্য।

ক্ষণিক জগতের বা প্রাতিভাসিক রজত-জ্ঞানের উক্ত দুই-প্রকার কারণের নিরোধ বা বিনাশ করিতে পারিলেই শূন্য-প্রজ্ঞা বা ব্রহ্মপ্রজ্ঞার উদয় হয়। 'কারণ' নষ্ট হইলেই 'কার্য্যের' নাশ, ইহা সতঃসিদ্ধ। সুতরাং বৌদ্ধমতে শূন্যাপ্তির উপায়, জগৎ-প্রতীতির কারণ নাশ এবং অমিতা অবিদ্যা নির্ব্বিকল্পা প্রজ্ঞাই একমাত্র কারণ-নাশের উপায়।

শঙ্করমতে মোক্ষোপায়

আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর মুক্তির উপায় নিরূপণকল্পে "কেবলোঽহম্" শীর্ষক একটী পদ্য রচনা করেন। তাহা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

"ব্রহ্মাভিন্নত্বাবিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্মসম্পদ্যতে বুধৈঃ ॥৩॥"

তৎকৃত অপরোক্ষানুভূতিতে :—

"ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষময়ো যতঃ ॥১০৬॥"

অর্থাৎ, ব্রহ্মের (ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের) অভিন্নত্ব-জ্ঞানই ভব-মোক্ষ অথবা সংসার মোচনের কারণ। তদ্দ্বারা বুধগণ অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥৩॥

চিদাত্মার অবলোকন-পূর্ব্বক প্রপঞ্চের রূপের ত্যাগ হইয়া থাকে। এই ত্যাগ মহদ্ব্যক্তিগণের পূজ্য, যাহা হইতে সদ্য মোক্ষময় হওয়া যায় ॥১০৬॥

চিদাত্মার অবলোকন বা ব্রহ্মাভিন্নত্ব চিন্তন প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা ব্রহ্ম-সম্পাদনরূপ ব্রহ্মাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানই বিশ্বরূপ অবিদ্যা বিনাশের কারণ। বুদ্ধ প্রজ্ঞাকেই সংসার-ক্লেশ-নাশের হেতু বলিয়াছেন। **বুদ্ধের এই 'প্রজ্ঞা' ও আচার্য্য শঙ্করের 'ব্রহ্মজ্ঞান' একই। প্রজ্ঞা ও ব্রহ্মে কোন পার্থক্য নাই। ইহা প্রদর্শনকল্পে শারীরক-ভাষ্যাদি বহুগ্রন্থে, ঐতরেয় উপনিষদের—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"-মন্ত্র উদ্ধার করিয়া উক্ত মতের সর্ব্বেব অনুমোদন করিয়াছেন। ঐতরেয় উপনিষদের অন্যত্র—"প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতাম্—প্রজ্ঞানেত্রো-লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা"—এইরূপ দৃষ্ট হয়।** উহার শঙ্কর যে ভাষ্য করিয়াছেন ও সায়নাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ উহা অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়—'প্রজ্ঞান' শব্দের অর্থ 'নিরূপাধিক চৈতন্য' এবং 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দের অর্থ "সর্ব্ব-জগৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় আরোপিত।" "প্রজ্ঞানে নিরূপাধিক চৈতন্যে পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং জগৎ প্রতিষ্ঠং রজ্জ্বাং সর্পবদারোপিতম্।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীপাদ শঙ্কর

বুদ্ধের প্রজ্ঞাকেই অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে নিরূপাধিক চৈতন্য-স্বরূপ এবং তাহাকেই সর্পারোপের ন্যায় ক্ষণিক জগৎ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রজ্ঞা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই ক্ষণিক বা প্রাতিভাসিক তাৎকালিক প্রপঞ্চের অপনোদন হইবে এবং শূন্যরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে। শঙ্কর আরও বলেন,—

"কার্য্যে কারণতা জাতা কারণে ন হি কার্য্যতা।
কারণত্বং ততো গচ্ছেৎ কার্য্যাভাবে বিচারতঃ॥"

—অপরোক্ষানুভূতি ১৩৫

কার্য্যে কারণতা থাকে, কিন্তু কারণে কার্য্যতা থাকে না। সুতরাং জগৎরূপ কার্য্যের ক্ষণিকতা বিচারপূর্ব্বক তাহার নিরোধ বা অভাব হইলে ব্রহ্মরূপ কারণত্ব প্রাপ্ত হয়॥১৩৫॥

পুনশ্চ অন্যত্র—

"কার্য্যে হি কারণং পশ্যেৎ পশ্চাৎ কার্য্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
কারণত্বং ততো গচ্ছেদবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ॥"

—অপরোক্ষানুভূতি ১৩৯

কার্য্যের ভিতরে কারণ অবলোকন করিয়া পরে কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। কার্য্য ও কারণের মধ্যে কার্য্য পরিত্যাগ হইলে অবশিষ্ট কারণত্ব আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। ইহাই কার্য্য-কারণ-বিচার॥১৩৯॥

বৌদ্ধগণের উদাহৃত আম্রের আম্রত্ব-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, শঙ্করের কার্য্য-কারণের বিচারের মধ্যে তাহাই অবশেষরূপে পাওয়া যায়। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, শঙ্করের উক্ত "অবশিষ্টং ভবেৎ" বাক্যের দ্বারা শূন্যকেই লক্ষ্য

করিতেছে কিনা? আম্রের আম্রত্ব নষ্ট হইলে কিছুই থাকে না অর্থাৎ শূন্যই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং 'অবশিষ্ট' শব্দের দ্বারা শঙ্কর প্রচ্ছন্নভাবে বুদ্ধের শূন্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব মোক্ষের উপায় সম্বন্ধে শঙ্কর বুদ্ধের মায়াবাদে বিভাবিত হইয়া নিজমত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন—এইরূপ বলিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না। মোক্ষের উপায় নিরূপণ-ব্যাপারে বুদ্ধ ও শঙ্করের একই মত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

বৌদ্ধমতে শূন্য ও ব্রহ্ম

এক্ষণে ব্রহ্মে ও শূন্যে পার্থক্য কি অথবা কোন প্রকার পার্থক্য আছে কিনা, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিচার করা হইতেছে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রে' শূন্যতত্ত্বরূপ পরম নির্ব্বাণের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"শক্তঃ কস্ত্বামিহস্তোতুং নির্নিমিত্তাং নিরঞ্জনাম্।
সর্ব্ববাগ্‌বিষয়াতীতাং যা ত্বং ক্বচিদনিশ্রিতা॥"১৯॥

উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়, শূন্যতত্ত্ব নির্নিমিত্ত, নিরঞ্জন, অনিশ্রিত এবং সর্ব্ববাগ্‌বিষয়াতীত বিধায় কেহ তাঁহার স্তুতি করিতেও সমর্থ নহে।

আমার পূর্ব্ব কথিত 'বৌদ্ধের শূন্যবাদ' বর্ণনে আমি পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি শূন্যতত্ত্বটী—

'আকাশাম্ নির্লেপাম্ নিষ্প্রপঞ্চাম্ নিরক্ষরাম্'।

'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র অষ্টাদশ পরিবর্ত্তে শাক্যসিংহ বুদ্ধ সুভূতির নিকট শূন্যের যাহা লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়াঽপি তে।
যা চ শূন্যতা অপ্রমেয়তা অপি সা॥"

অর্থাৎ হে সুভূতি, যাহা শূন্য তাহাই অক্ষর। যাহাকেই শূন্যতা বলা যায়, তাহাই অপ্রমেয়। পুনরায় উক্ত গ্রন্থে বলিতেছেন—

"অপ্রমেয়মিতি বা অসজ্জেয়মিতি বা অক্ষয়মিতি বা শূন্যমিতি বা অনিমিত্তমিতি বা অপ্রনিহিতমিতি বা অনভিসংস্কার ইতি বা অনুৎপাদ ইতি বা অজ্ঞাতিরিক্ত বা অভাব ইতি বিরাগ ইতি বা নিরোধ ইতি বা নির্ব্বাণমিতি।"—

দেবপুত্রগণের প্রশ্নের উত্তরে উক্ত গ্রন্থের দ্বাদশ পরিবর্ত্তে শূন্যের লক্ষণ জানাইতেছেন—

"শূন্যমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনভিসংস্কার ইত্যনুৎপাদ ইত্যনিরোধ ইত্যসংক্লেশ ইত্যব্যবদানমিত্যভাব ইতি নির্ব্বাণমিতি ধর্ম্ম ধাতুরিতি তথাতেতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। নৈতানি লক্ষণানি রূপনিশ্রিতানি।"

উক্ত বাক্যসমূহ হইতে জানা যায়, শূন্যতত্ত্ব অপ্রমেয়, অসংজ্ঞেয়, অক্ষয়, অনিমিত্ত, অপ্রনিহিত, অনভিসংস্কার, অজ, অজাতি, অভাব, অনিশ্রিত। অনুৎপাদ, অনিরোধ, অসংক্লেশ, অব্যবদান, অরূপ এবং আকাশের মত নির্লেপ, নিষ্প্রপঞ্চ, নিরক্ষর, নির্নিমিত্ত, নিরঞ্জন, নিরোধ, নির্ব্বাণ, নিরবদ্য, বিরাগ, রাগবিষয়াতীত ইত্যাদি। 'শূন্য'তত্ত্বের এই লক্ষণগুলি বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে শঙ্করের 'ব্রহ্ম'-তত্ত্ব

হইতে কিছুমাত্র পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় না। এমন কি, আচার্য্য-শঙ্কর ব্রহ্মকেও শূন্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন নিম্নে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

শঙ্করমতে ব্রহ্মও শূন্য

শ্রীপাদ শঙ্করের বিবেকচূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, ব্রহ্ম-নামাবলীমালা প্রভৃতি আদ্যন্ত আলোচনা করিলে উক্ত শূন্যের লক্ষণসমূহ ব্রহ্ম-লক্ষণরূপে পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে শঙ্করাচার্য্যের লিখিত অধিক প্রমাণ উদ্ধার করা প্রবন্ধ-বিস্তারভয়ে নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি। তবে উক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিপাদন জন্য দুই একটী শ্লোক মাত্র লিপিবদ্ধ হইল।—

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈক বস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥
(বিবেকচূড়ামণি-৪০২)

বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্‌বক্তুং কেন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥
(অপরোক্ষানুভূতি-১০৮)

নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিরাকারোঽহমক্ষরঃ।
পরমানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥ (ব্রহ্মনামাবলীমালা-৪)

উক্ত শ্লোকগুলি হইতে নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিরবদ্য, অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি ব্রহ্মের যে স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা 'শূন্য' ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শূন্যের লক্ষণ-

বিচারে 'অভাব' বলিয়া একটী লক্ষণ দৃষ্ট হয়, উহা দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনাদি ভাবশূন্যরূপ অভাবকেই লক্ষ্য করিতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রাতঃস্মরণস্তোত্রের দ্বিতীয় শ্লোকে "যন্নেতি নেতি বচনৈঃ" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত শূন্যলক্ষণাত্মক অভাবকেই লক্ষ্য করিতেছে। যে শূন্য, **"সর্ব্ববাক্ বিষয়াতীত' সেই ব্রহ্ম "শব্দবিবর্জ্জিত"। যে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে- "তদ্‌বক্তুং কেন শক্যতে", সেই শূন্যকেই বৌদ্ধগণ "শক্তঃ কস্ত্বামিহস্তোতুম্" বলিতেছেন। বৌদ্ধগণ যাহাকে "নিরঞ্জনাম্, নির্লেপাম্" বলিতেছেন, শঙ্কর তাহাকেই নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগত-ক্লেশঃ ইত্যাদি বলিতেছেন** (মুণ্ডকোপনিষদের ৩য় মুণ্ডক ৪৭ শ্লোকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এখন সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখুন, শঙ্করের ব্রহ্মবাদ ও বৌদ্ধের শূন্যবাদ একই কিনা?

অদ্বয়বাদী ও অদ্বৈতবাদী

বৌদ্ধ-চিন্তা-স্রোতেই যে মায়াবাদের জীবন পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে। অমরকোষ বুদ্ধকে **অদ্বয়বাদী**-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন এবং আচার্য্য শঙ্করও যে **অদ্বৈতবাদী** তাহা লোক-প্রসিদ্ধ। অদ্বয়বাদ ও অদ্বৈতবাদ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে উভয় মতবাদ একই বলিয়া বোধ হইবে।

তথাপি, উভয় বিচারের মধ্যে আশু পার্থক্য যাহা প্রতীত হয়, তাহার কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। **পরিণাম-বিচারে** বুদ্ধ শূন্যকে অসৎস্বরূপ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—শূন্যকে শূন্য বলিয়া জানিবে, অভাব বলিয়া

জানিবে, **নির্ব্বাণ** বলিয়া জানিবে। এবং শ্রাবক ও বোধিসত্ত্ব-শ্রেণী যদি উক্ত শূন্যকে শূন্যরূপ না জানিয়া বা নির্ব্বাণকে একটি গুণাত্মক-বিশেষ অবস্থাকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে উহাও "মায়োপম স্বপ্নোপম"।

পরিণাম-বিচারে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ বলিয়াছেন এবং অন্যত্র আনন্দস্বরূপ এবং নির্ব্বাণস্বরূপও বলিয়াছেন। সাধারণ বিচারে উভয় মতের মধ্যে পরিভাষায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাবের বা চিন্তা-ধারায় যে কোন ভেদ নাই, তাহা একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 'নির্ব্বাণ' অর্থে শুষ্কতাশূন্য সারস্য বুঝাইলে কাহারও 'নির্ব্বাণ' শব্দে আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু উভয়ই তাঁহাদের স্ব-স্ব তত্ত্বকে অর্থাৎ শূন্যকে ও ব্রহ্মকে 'নির্ব্বাণ'-স্বরূপ বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর মুক্তির পর ব্রহ্মের যে 'আনন্দ' স্বরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে উক্ত লক্ষণ নিরর্থক প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ তাঁহার মতে উহার প্রাপক কেহ নাই। সুতরাং প্রাপ্য-প্রাপকত্বের অভাব-হেতু উহা 'নিরানন্দ স্বরূপ' হইলেই বা দোষ কি? অর্থাৎ সুখেরও ভোক্তা নাই, দুঃখেরও ভোক্তা নাই।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—

"ভাববৃত্ত্যাহি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যাহি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যাহি ব্রহ্মত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ॥

(অপরোক্ষানুভূতি-১২৯)

অর্থাৎ ভাববৃত্তির দ্বারা ভাববস্তু এবং শূন্যবৃত্তির দ্বারা শূন্যতা লাভ হয়। ব্রহ্মবৃত্তি অবলম্বন করিলে ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়।

উক্ত বাক্যের দ্বারা তিনি শূন্যবাদ অপেক্ষা ব্রহ্মবাদের একটী বৈশিষ্ট প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বিচার করিলে উক্ত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। উহা কেবল কথার কথা মাত্র। উক্ত শ্লোকের ইঙ্গিত এই যে, ভাবরূপ ব্রহ্মবৃত্তি অভ্যাস করিলে সৎস্বরূপ এবং ভাবস্বরূপ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর অভাবরূপ শূন্যবৃত্তি স্বীকৃত হইলে অসৎস্বরূপ শূন্যই লাভ হইবে। এখানে সদ্বস্তু ব্রহ্ম ও অসদ্বস্তু শূন্যে পার্থক্য কি, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকায় ও না থাকায় ক্ষতিবৃদ্ধি কাহার? 'দ্রষ্টৃ-দর্শন-দৃশ্যাদি-ভাবশূন্য বস্তু'কে প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাব বা সৎ বলা অথবা অভাব বা অসৎ বলার মধ্যে পার্থক্য যে কি, তাহার অনুসন্ধান করিলে কিছু পাওয়া যাইবে কি? অনাবিস্কৃত বহু দ্রব্যের সত্তা স্বীকার করিলে তাহাতে যেরূপ জীবের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সেইরূপ বহু দ্রব্যের অনস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না—ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের বিচার। যেখানে যে বস্তুর পারমার্থিক দৃশ্যত্ব নাই এবং তাহার কেহ দর্শকও নাই, সে স্থলে তাহাকে 'সৎ'ই বলুন আর 'অসৎ'ই বলুন—বস্তুতঃ একই হইয়া পড়ে—কোনওরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

এস্থলে দার্শনিক কবিকূল চূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ আলোচ্য। যথা—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে **অধিক** ॥ (মঃ ৬।১৬৮)

তিনি বুদ্ধের সঙ্গে আচার্য্য শঙ্করের তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই, এমন কি শঙ্করকে আরো অধিক অর্থাৎ কঠোর নাস্তিক বলিয়া জানাইয়াছেন। কারণ সাধারণ লোক সহজে শঙ্করকে বৈদিক মনে করিয়া বা আস্তিক ভাবিয়াই নাস্তিক হইয়া পড়িবে। ইহাই কলিকাল স্থাপনের বৈশিষ্ট্য।

মায়াবাদকে বৌদ্ধবাদ বলিয়া পরিচয় না দিয়া উহা গোপন রাখিবার কারণ

অদ্বয়বাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকিলেও আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার মতবাদকে বৌদ্ধমতবাদ বলিয়া পরিচয় দেন না—যদিও তিনি যে প্রকৃত বৌদ্ধ, তাহা অন্তরে অন্তরে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার আত্মপরিচয় গোপন রাখার বিশেষ কারণ ছিল। সে-কারণ তাঁহার দার্শনিক বিচারের পার্থক্যই হেতু নহে—ভগবদাদেশই তাঁহার মূল কারণ। আচার্য্য কূলশিরোমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সম্বন্ধে এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৮০)

"মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।"

(পদ্মপুরাণে উঃ নামকথনে ৬২ অ, ৩১)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্মে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল,—

"পরমহংস বাবাজী মহাশয় শঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়া দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—মহোদয়, 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ', একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের গুরু, এজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ণব। যে-সময়ে তিনি ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, সে-সময় তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে বেদশাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ক্রিয়া-কলাপ বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। শূন্যবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবত্মার তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত থাকিলেও ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত অনিত্য। সে-সময় ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাবতার উদিত হইয়া বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপনপূর্ব্বক **শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করেন।** এই কার্য্যটী সাধারণ। ভারতবর্ষ শ্রীশঙ্করের নিকট এই বৃহৎ কার্য্যের নিমিত্ত চিরঋণী থাকিবেন। কার্য্যসকল জগতে দুই প্রকারে বিচারিত হয়। কতকগুলি কার্য্য তাৎকালিক ও কতক-গুলি কার্য্য সার্ব্বকালিক। শঙ্করাবতারের সেই বৃহৎ-কার্য্য তাৎ-কালিক। তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদিত হইয়াছে। শঙ্করাবতার যে-ভিত্তি পত্তন করিলেন, সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজা-বতার ও শ্রীমধ্বাদি আচার্য্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাসাদ

নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব শঙ্করাবতার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম বন্ধু ও একজন প্রাগুদিত আচার্য্য।"—(জৈবধর্ম্ম ২য় অধ্যায়)

ভগবানের আদেশ পালনকারী আচার্য্যের পাদপদ্মে আমি অপরাধ না করিয়া, তিনি যে ভগবদাদেশ সুষ্ঠুরূপে পালন করিবার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্নভাবে শূন্যবাদকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাই বিজ্ঞগণ-সমক্ষে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছি।

বুদ্ধের প্রতি আচার্য্য শঙ্করের কি মনোভাব, তাহা তাঁহার "দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রে" প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি গুপ্তভাবে বুদ্ধের প্রতি যে স্তব করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—

"চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্ন-সংশয়াঃ॥"

উক্ত শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, তিনি দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রচ্ছলে বুদ্ধের প্রতি কি প্রকার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন! 'চিত্রং'-শব্দে অতীব সম্মানসূচক মুগ্ধের ভাব বুঝায়। বটতরু-মূলে গুরুশিষ্য উভয়েই মৌনভাবে আছেন। শিষ্যেরা সকলেই বৃদ্ধ, আর গুরু যুবা। গুরু মৌনভাবে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাতেই শিষ্যগণের সন্দেহ দূর হইতেছে।

উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোক আলোচনা করিলেও ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত শ্লোকদ্বয় শাক্যসিংহ বুদ্ধের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শূন্য সম্বন্ধে নৃসিংহতাপনী উপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্য দর্শনে আচার্য্য

মহানন্দের সহিত শূন্যতত্ত্বকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। উক্ত বাক্য যথা,— "আনন্দঘনং শূন্যম্ ব্রহ্ম-আত্মপ্রকাশং শূন্যম্"। (নৃসিংহতাপনী—উঃ ৬।২,৪)

অর্থাৎ শূন্যই আনন্দস্বরূপ, শূন্যই ব্রহ্মস্বরূপ।

বৌদ্ধগণও উক্ত মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়া মিলিন্দপঞ্‌হ গ্রন্থে শূন্যরূপ নির্ব্বাণকে "একান্ত সুখম্", "বিমুক্ত সুখম্ পটিসম্বেদি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা একান্ত সুখস্বরূপ বিমুক্ত সুখস্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ অমরসিংহ নির্ব্বাণকে নিঃশ্রেয়স অমৃত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।— "মুক্তিং কৈবল্যং নির্ব্বাণং শ্রেয়োনিঃশ্রেয়সামৃতম্"। উহার টীকাকার বলেন,—"নির্ব্বাতেঃ আত্যন্তিক-দুঃখোচ্ছেদে ভাবে ক্ত"। সুতরাং আনন্দঘন শূন্যকে, আত্মপ্রকাশ শূন্যকে, ব্রহ্মস্বরূপ শূন্যকে বৌদ্ধেরাও আত্যন্তিক দুঃখচ্ছেদরূপ, অনন্তসুখরূপ, নিঃশ্রেয়স অমৃতস্বরূপ, বিমুক্ত সুখস্বরূপ বলিয়া জানেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধের যাহা শূন্য, শঙ্করের তাহাই ব্রহ্ম।

শাঙ্কর যুক্তিতেই শঙ্করের বৌদ্ধত্ব স্থাপন

আমরা শঙ্করের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধত্ব জ্ঞাপনার্থ দেখাইয়াছি যে, জগদ্বিচারে বৌদ্ধের ক্ষণিক ও শঙ্করের প্রাতিভাসিক বা তাৎকালিক-বাদ একই; মোক্ষের অভিধেয় বিচারে বৌদ্ধের বন্ধন-কারণ নাশকল্পে প্রজ্ঞাপারমিতা ও শঙ্করের উক্ত কারণ-নাশকল্পে ব্রহ্মজ্ঞান; এবং মোক্ষ-রূপ প্রয়োজন বিচারে বৌদ্ধের শূন্যত্ব ও শঙ্করের ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি বিচারাবলী একই। কতিপয়

পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়, শঙ্কর মায়াবাদী এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। অদ্বৈতবাদী শাঙ্কর সাম্প্রদায়িকগণ পুরাণসমূহের উক্তি-গুলিকে **প্রক্ষিপ্ত** বলিয়া 'খেয়ালি' যুক্তি দ্বারা বলিতে চান যে, তাঁহারা মায়াবাদীও নন্ বা বৌদ্ধও নন্। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত বাক্যসমূহকে প্রক্ষিপ্ত না বলিয়া সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া এক আশ্চর্য্যজনক ঐতিহাসিক যুক্তির বৃথা অবতারণা করিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত বলিতে চাহেন--উক্ত পুরাণসমূহ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। শঙ্করের পরে পুরাণ রচিত হইয়াছে যাহারা বলেন, তাহারা ঐ বাক্যগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাহারা আরও বলিয়া থাকেন—যেহেতু পুরাণে শঙ্করের নাম উল্লিখিত হইয়াছে সেহেতু শঙ্কর যীশুখৃষ্টেরও জন্মের পূর্ব্বে।

দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক জ্ঞানশূন্য মূর্খ ভণ্ডদের জানা উচিত যে, শঙ্করের সমসাময়িক পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, গোবিন্দপাদ প্রভৃতিকেও খৃষ্টের পূর্ব্বেকার বলিয়া মানিতে হয়। সে যাহা হউক, এই সমুদয় যুক্তিই এক অসৎ উদ্দেশ্যমূলক। উক্ত যুক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বমুলক বহু বিচার প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে মায়া-বাদের জীবনী প্রকাশ করিতে গিয়া মায়াবাদীর উক্তি-সমূহকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি এস্থলে স্ব-পক্ষের যুক্তি ও অন্যপক্ষ প্রদর্শন করিলাম

না। তর্কস্থলে পুরাণগুলিকে শঙ্করের পরবর্ত্তী বলিয়া অন্যায়-পূর্ব্বক ধরিয়া লইলেও অথবা শঙ্কর সম্বন্ধে তৎ তৎ পুরাণের উক্তিগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মানিয়া লইলেও দেখান যাইতেছে যে, শঙ্কর একজন প্রধান মায়াবাদী এবং বিশুদ্ধ বৌদ্ধ।

শঙ্কর মহাযানিক বৌদ্ধ

শঙ্করের আবির্ভাব খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক আচার্য্য ভাস্করের সহিত শঙ্করের বিচার-যুদ্ধ হয়। ইহা কোন অদ্বৈতবাদীই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য আনন্দগিরির 'শঙ্কর-বিজয়' গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আচার্য্য শঙ্কর ভাস্করকে বিচারে পরাজিত করিতে পারেন নাই—ইহাও জানা যায়। পরন্তু শ্রীভাস্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে শঙ্করের ভাষ্য খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ ও মায়াবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দূর হইতে অসাক্ষাতে লেখনী দ্বারা নানা প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা, শব্দের ছড়াছড়ি না করিয়া সাক্ষাদ্‌ যুক্তি বা সম্মুখ-বিচার করিতে হইলেই মায়াবাদ কোথাও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কোথাও বা আত্মগোপন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে, কোথাও বা মতান্তর গ্রহণ করিয়া শান্তি পাইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি অধিক বিচার-যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ক্রমশঃ উদ্ধার করিয়া আমার উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিব। এক্ষণে আচার্য্য ভাস্কর শঙ্কর-সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধার করিলাম।

"তথাচ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং **বিছিন্নমূলং মহাযানিক-বৌদ্ধ-গাথায়িতং মায়াবাদং ব্যবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।"**

—(ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যম্—শ্রীভাস্করাচার্য্য-বিরচিতম্ ; ১৯১৫ সালে চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত—৮৫পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ (মায়াবাদী শঙ্কর) ঘৃণিত মূলহীন (সার-রহিত) মহাযানিক বৌদ্ধগাথাগুলিকেই (তাঁহার নিজমতরূপ) মায়াবাদরূপে বর্ণনা করিয়া লোকদিগকে বিশেষভাবে মোহিত করিতেছে। এবং অন্যত্রও—

"যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপ্যনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ"।

—(ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্-ভাস্করাচার্য্য-বিরচিতং—১৯০৩ সালে চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত—১২৪ পৃষ্ঠা)

এই ন্যায়ের দ্বারা স্বয়ং সূত্রকারই (ব্যাস) বৌদ্ধমতাবলম্বি-মায়াবাদিগণকেও নিরস্ত করিয়াছেন, জানিতে হইবে।

ভাস্করাচার্য্য শঙ্করমতকে খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত বাক্যসম্বলিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাষ্যের প্রারম্ভেই তিনি লিখিয়াছেন,—

সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্ত্যা স্বাভিপ্রায়-প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং * শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং **তন্নিবৃত্তয়ে ॥**

—(ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্—ভাস্করাচার্য্য-বিরচিতং—১৯০৩ সালে চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত ১ম পৃষ্ঠা)

* যদিদং শাস্ত্রম্ ইতি পাঠান্তরম্।

অর্থাৎ **শঙ্করমতকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই** এই শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইতেছে। পুরাণ আধুনিক হউক বা তাহা প্রাচীন হউক এবং তাহার উক্তিসমূহ প্রক্ষিপ্তই হউক, আর না-ই হউক, ভাস্করের উক্ত বাক্যের দ্বারা শঙ্কর কি মায়াবাদী এবং মহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন না? আচার্য্য ভাস্কর শঙ্করের সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দী; ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং তাঁহার উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে,—আচার্য্য শঙ্করের প্রকটকালেই বিশেষ বিশেষ আচার্য্যবর্গ তাঁহাকে মহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া জানিতেন। কারণ মহাযানিক বৌদ্ধগাথাগুলি অবলম্বন করিয়াই মায়াবাদের শরীর, মন ও জীবন গঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়াবাদের যাবতীয় সিদ্ধান্তই বৌদ্ধগণের অদ্বয়বাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে আধুনিক কয়েকজন বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদীর স্বীকার-উক্তি সন্নিবেশিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অদ্বৈতবাদী শিবনাথ শিরোমণির মত

অদ্বৈতবাদী মাননীয় শিবনাথ শিরোমণি মহাশয় আচার্য্য শঙ্করের মত আলোচনা করিতে গিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ঈশোপনিষদ্ প্রভৃতি দশখানি উপনিষদের টীকা, বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বেদান্ত-ভাষ্য বা শারীরক ভাষ্যই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এই গ্রন্থে তাঁহার অসামান্য

প্রতিভা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে, তিনি বৌদ্ধ-মত নিরস্ত করিতে গিয়া বৌদ্ধদেরই যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ দর্শনকার নাগার্জ্জুনের মত তিনি অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।”

—(১৩০৮ সালে প্রকাশিত শব্দার্থমঞ্জরী পরিশিষ্ট, ৩৫ পৃষ্ঠা)

শিরোমণি মহাশয় শঙ্করের প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিয়া বলিতে চাহেন—শঙ্কর বৌদ্ধমত নিরসনকারী। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি বৌদ্ধমতের পোষণকারী; আদৌ নিরস্তকারী নহেন। তৎকালের সাধারণ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা আনয়ন করিবার জন্যই অন্যায় করিয়া ঐরূপ উক্তি প্রচার করা হইয়াছে। বৌদ্ধ-বিতাড়ন-সম্বন্ধে শঙ্কর-বিরোধী অন্যান্য আচার্য্যবর্গের কীর্ত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় ও আদরণীয়, ইহা আমরা পরে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব।

অদ্বৈতপন্থী রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের মত

বর্ত্তমান শতাব্দীতে গৌড়দেশের মধ্যে মাননীয় রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ই একজন প্রধান ও গোঁড়া অদ্বৈতবাদী। তিনি অযথা শঙ্কর-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অন্য বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অন্যায়পূর্ব্বক কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহাতে আমরা তাঁহার গোঁড়ামির পরিচয়ও পাইয়াছি। সে যাহা হউক, প্রসিদ্ধ রাজেন বাবুও তাঁহার উপাস্য শঙ্করকে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধমতের একজন প্রধান পোষক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার লেখনী হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতেছি।—

"বুদ্ধদেবের পর প্রায় পাঁচশত (৫০০) বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য রাজের (৫৭ খৃঃ পূঃ) আবির্ভাব পর্য্যন্ত **অদ্বৈত-মত বৌদ্ধমতের মধ্য দিয়াই প্রবল-ভাবে প্রচলিত হইতে থাকে।**

(রাজেন ঘোষ-কৃত অদ্বৈতসিদ্ধি ভূমিকা—১০ পৃষ্ঠা)

রাজেনবাবু আরও বলিতে চাহেন যে, **বৌদ্ধমত অবৈদিক নহে। উহাও বৈদিক। কারণ বৌদ্ধমত অবৈদিক হইলে শঙ্করের মতও বাধ্য হইয়া অবৈদিক হইয়া পড়ে।** তবে তিনি বৌদ্ধের মতের সহিত শঙ্করের একটু পার্থক্যও বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা এই যে—**বুদ্ধের মত বৈদিক হইলেও মূলচ্ছেদী, আর শঙ্করের তাহা মূলরক্ষী (?)।** প্রকৃতপ্রস্তাবে শঙ্করও মূলচ্ছেদী। রাজেন বাবু বলেন—

"**বৌদ্ধমত বেদমূলক হইলেও** মূলচ্ছেদী মতে পরিণত হইল।" তিনি আচার্য্য শঙ্করকে অনেক রকমে বৌদ্ধত্বের হাত হইতে রক্ষা করিবার অনেক চেষ্টা করিলেও তাহা কোনও রকমেই সম্ভবপর হইতেছে না।

মায়াবাদ প্রচারের কারণ

মায়াবাদ প্রচারের কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। তথাপি প্রসঙ্গক্রমে আরও দুই একটী কথার অবতারণা করিয়া মায়াবাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥"

"মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টি রেষোত্তরোত্তরা ।"

(পদ্মপুরাণ)

"বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যামি বৃষধ্বজ ।"

"চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবে স্থিতঃ।"

—(কূর্ম্মপুরাণ-পূর্ব্বভাগ)

উক্ত বচনসমূহের দ্বারা প্রধানতঃ শঙ্করকেই মায়াবাদের জন্মদাতা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু "প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে" বাক্যের দ্বারা বুদ্ধকেও উক্ত মতবাদের আদি জনক বলিয়া বুঝা যায়। এবং "মাঞ্চ গোপয়" এই উপদেশের দ্বারা "ঈশ্বরেচ্ছা" মায়াবাদ সৃষ্টির একটী কারণ ইহাও প্রতিপন্ন হয়। ভগবান্ এপ্রকার ইচ্ছা প্রকাশের লীলা ভক্তবাৎসল্যহেতুই প্রদর্শন করিয়াছেন। "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ"—সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীব কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যাওয়ায় "সোঽহং"ভাবে বিভাবিত হইয়া ভক্তগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিতে থাকে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ভগদ্বিস্মৃতি এবং তদ্দরুন ঈশ্বর-ইচ্ছাই মায়াবাদ সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এবং ব্রহ্মার সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই কাহাকেও কাহাকেও অদ্বয়জ্ঞান পথের পথিক হইতে দেখা যায়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—এই যুগত্রয়ের প্রতি যুগেই অতি সামান্য সামান্য দুই একজন করিয়া জ্ঞানবাদী দৃষ্ট হয়। তাহাদের জ্ঞানের প্রভাবে বা মায়াবাদের প্রখর তাপে ভক্তিলতা শুষ্কপ্রায়া হইতে থাকিলে ভগবান্ ধর্ম্মরূপ ভক্তিশাস্ত্র সংস্থাপনের জন্য

এবং মায়াবাদরূপ দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য যুগে যুগেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। 'দেবগণের রক্ষণ ও অসুরগণের বিনাশ'—ভগবান্ বলদেবেরই লীলা। তাই তিনি উক্ত যুগত্রয়ে আবির্ভূত হইয়া মায়াবাদিগণকে তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিয়া ভক্তিধর্ম্মে স্থাপন করেন। মায়াবাদিগণ তাহাদের স্বমতের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে না পারিয়া ভক্তির সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শুষ্ক জ্ঞানপথ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করতঃ ভগবানের নিত্য সেবাধর্ম্মে মস্তক বিক্রীত করিয়াছেন। **(আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্মাবলম্বিগণ একজনও তাঁহাদের স্বমত পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদীর নিকট মস্তক বিক্রয় করেন নাই)।** আমি ঐতিহাসিক ভাবেই সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বিষয়টী বর্ণন করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। সুতরাং যাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্য বিষয়ের দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিতেছি মাত্র।

সত্যযুগে জ্ঞানবাদ ও তাহার পরিণতি 'চতুঃসন'

সত্যযুগে সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার—এই চারিজন ঋষির কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। ইঁহারা চতুঃসন নামে পরিচিত। প্রাজাপাত্যনিবন্ধন যে-প্রকার জীবের

জন্ম হয় অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সম্মেলনে যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া লোক-সমাজে প্রচলিত আছে, চতুঃসন তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। **ব্রহ্মার কল্পনাপ্রসূত সনকাদি ঋষি-চতুষ্টয় মানসপুত্ররূপে তাঁহার প্রথম সৃষ্টি-কৌশল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।** তাঁহারা বাল্যাবধি জ্ঞানযোগে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। চতুঃসনের এই জ্ঞানযোগ কতকটা নির্ব্বিশেষপর হওয়ায় শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল হইয়াছিল। তাহাতে পিতা ব্রহ্মা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহাদের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। সৃষ্টির প্রথম সন্তানগণের এই প্রকার অবস্থা দর্শন করিয়া **ভগবান্ হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া** তাঁহাদিগকে ও নারদকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,—

> "তুভ্যঞ্চ নারদ! ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
> ভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
> জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং
> যদ্বাসুদেব-শরণা বিদুরঞ্জসৈব॥" (ভাঃ ২।৭।১৯)

অর্থাৎ ব্রহ্মা, নারদ ও চতুঃসনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—ভগবান্ হংসাবতারে তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া ভক্তিযোগ ও তদনুকূল ভগবদ্বিষয়ক-জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন।

উক্ত শ্লোকের 'তুভ্যঞ্চ নারদ' বাক্যের মধ্যে 'চ' এই শব্দের দ্বারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বাচার্য্য গোবিন্দভাষ্যকার

আচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব সনকাদি ঋষিচতুষ্টয়কে বুঝাইতেছেন, বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লঘুভাগবতামৃতের হংসাবতার কথনে ৭২ শ্লোকের 'সারঙ্গ রঙ্গদা' টীকায় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন,—"তুভ্যঞ্চেতি চাৎ সনকাদিভ্যঃ" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী হইতে জানা যায়, শেষাবতার সনকাদি ঋষিগণকে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান।
নিরবধি গুণগান অন্ত নাহি পান॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে॥

—(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২০-১২২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, কেবল হংসাবতারই তাঁহাদিগকে ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা শিক্ষা দিয়াছেন এমন নহে, পরন্তু শেষাবতারও ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি-বিষয়ক অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত শাস্ত্র। সনকাদি ঋষিগণ ভক্তাবতার অনন্তদেবের নিকট সেই ভাগবতের সিদ্ধান্ত শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাই সনক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ **নিম্বাদিত্যস্বামী** বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচারকল্পে চতুঃসনকেই পূর্ব্বাচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়া বেদান্তের "পারিজাত

সৌরভ"-নামক ভাষ্য প্রকাশ করেন এবং সনকাদি ঋষিগণের নামানুসারেই এই সম্প্রদায়ের নাম 'সনক-সম্প্রদায়' হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, **শেষ ও হংসাবতারই এই চতুঃসনের গুরু ছিলেন।** উভয়ের নিকট তাঁহারা শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণের পর শুষ্কজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিধর্ম্মের আচার্য্যগণের মধ্যে পরিগণিত হন।

বাস্কলি

বাস্কল উপাখ্যানে জানা যায়, ইনি অদ্বৈতবাদী বাধ্বঋষির নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'বাধ' বলিয়া থাকেন। বাধ্বঋষির অন্তে বাস্কল (বাস্কলি) একজন প্রসিদ্ধ মায়াবাদী হইয়াছিলেন, এ প্রকার জনশ্রুতি আছে। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের ৩৷২৷১৭ সূত্রের ভাষ্যে বাধ্ব-বাস্কলির কথোপকথন শ্রুতি হইতে প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম।—

"বাস্কলিনা চ বাহ্বঃ (র্ধ্বঃ) পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রুয়তে স হোবাচাধাহি ভগবো ব্রহ্মেতি স তুষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ—ব্রুমঃ খলু, ত্বন্তু ন বিজানা-স্যুপশান্তোঽয়মাত্মা।"

অর্থাৎ মায়াবাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইতে হইলে চুপ করিয়া 'বুঁধ' হইয়া বসিয়া থাকিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে। যুক্তি, বিচার বা শাস্ত্র-জ্ঞানের দ্বারা মায়াবাদের ব্রহ্ম-বিষয় জানিবার

কোন উপায় নাই। আমার পূর্ব্বপ্রদর্শিত শঙ্করকৃত দক্ষিণা-মূর্ত্তিস্তোত্রের দ্বাদশ শ্লোক 'বাধ্ব বাস্কল' উপাখ্যানেরই প্রতি-ধ্বনি। শঙ্করোদ্ধৃত উক্ত শ্রুতিবাক্যের বেদান্তবাগীশ-কৃত মন্তব্য-সমেত অনুবাদ আপনাদিগকে জানাইতেছি। যথা—

শ্রুতিতে আরও শোনা যায়, বাস্কলিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাধ্ব নিরুত্তরতার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। বাস্কলি, "হে ভগবন্, ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান"—এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাধ্ব নিরুত্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার "ব্রহ্ম বলুন" বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি ত নিশ্চয় বলিতেছি, তুমিই জানিতে পারিতেছ না যে, এই আত্মা উপশান্ত অর্থাৎ অখণ্ডৈকরস অদ্বৈত।" (অভিপ্রায় এই যে, নির্ব্বিশেষহেতু তাহা বাক্যপথের অতীত, বলিবার অযোগ্য, সুতরাং নিরুত্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর)।

উক্ত প্রমাণ-দৃষ্টে বাস্কল একজন মায়াবাদী ছিলেন, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হয়। এই বাস্কল বা বাস্কলির অন্য পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দেখান যাইতেছে। যথা,—

হিরণ্যকশিপোর্ভার্য্যা কয়াধুর্নাম দানবী।
জম্ভস্য তনয়া সা তু সুষুবে চতুরঃ সুতান্॥
সংহ্লাদং প্রাগনুহ্লাদং হ্লাদং প্রহ্লাদমেব চ।
তৎস্বসা সিংহিকানাম রাহুং বিপ্রচিতোঽগ্রহীৎ॥

* * * *

অনুহ্লাদস্য সূর্য্যায়াং বাস্কলো মহিষস্তথা॥—
(ভাঃ ৬।১৮।১২-১৩,১৬)

অর্থাৎ জম্ভাসুর-তনয়া কয়াধু নাম্নী দানবী হিরণ্যকশিপুর পত্নী ছিলেন। তিনি ক্রমে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ নামক চারিটী পুত্র প্রসব করেন। সিংহিকা নাম্নী তদীয় ভগিনী বিপ্রচিৎ নামক-দানবের সংসর্গে রাহুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন (১২-১৩)। অনুহ্লাদের সূর্য্যা নাম্নী ভার্য্যা হইতে বাস্কল ও মহিষ এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥১৬॥

হিরণ্যকশিপুর ঔরসে কয়াধুর গর্ভে অনুহ্লাদের জন্ম হয়। পিতামাতা অসুর বিধায় অনুহ্লাদও তাহাদের অপেক্ষা অন্যরূপ কিছু হইলেন না। এই অনুহ্লাদের পুত্র বাস্কল। সুতরাং **বাস্কলও তদ্‌যুগে অসুর বলিয়াই খ্যাত ছিলেন।** মায়াবাদের ইতিহাসে এ প্রকার উদাহরণ প্রতিযুগেই পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহ্যের যদি কিছুমাত্র প্রমাণিকতা থাকে, তবে **মায়াবাদের চিন্তাস্রোত যে অসুরকুলে ও রক্ষকুলেই অধিকরূপে আদৃত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়।** নিরপেক্ষ সরল-হৃদয় মুণি-ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া ছিলেন, তাঁহারা ভগবদবতারগণের দ্বারা শোধিত হওয়ায় মায়াবাদ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ভগবৎ-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মায়াবাদাশ্রিত কঠিন-হৃদয় অসুরগণ অত্যন্ত 'গোড়া' বিধায় ভক্তিতত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই। ভক্তিতত্ত্বৈকরক্ষক ভগবান্ এবং ভগবৎ অবতারগণ উক্ত অসুর-গণের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করিয়া ভক্তিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহাদের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। ভগবদবতার

বামনদেব এই বাস্কলিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁহার শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত গ্রন্থে বামনদেবের বাস্কলি-উদ্ধার ব্যতীত আরও দুইবার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—বলি ও ধুন্ধের যজ্ঞে বামনদেবের আরও দুইবার আবির্ভাব হয়। উক্ত গ্রন্থের অষ্টাদশাবতার শ্রীবামনদেবের বিষয় বর্ণনক্ষেত্রে অশীতি (৮০) শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

> বামনস্ত্রিরভিব্যক্তিং কল্পেঽস্মিন্ প্রতিপেদিবান্।
> তত্রাদৌ দানবেন্দ্রস্য বাস্কলেরধ্বরং যযৌ॥"

অর্থাৎ এই কল্পে বামনদেবের তিনবার অভিব্যক্তি হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বাস্কলি নামক দানবেন্দ্রের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন।

বামনদেব বাস্কলি অসুরের যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপে সত্যযুগে চতুঃসন জ্ঞানবাদ ত্যাগ করিয়া ভক্তিপথাশ্রয় করায় এবং বাস্কল দানবের উদ্ধারের দ্বারা অদ্বৈতবাদের বিনাশ ও ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

ত্রেতাযুগে অদ্বৈতবাদ ও তাহার পরিণতি
'বশিষ্ঠ'

অদ্বৈতবাদিগণ ত্রেতাযুগে অদ্বৈতচিন্তার অধিষ্ঠান বশিষ্ঠাদি-হৃদয়ে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরাম-জনক দশরথ পুত্রাকাঙ্ক্ষায় যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ছিলেন, তখন বশিষ্ঠমুনি তৎকর্ত্তৃক আহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন কীর্ত্তিবাসও তাঁহার রামায়ণে লিখিয়াছেন—

"বশিষ্ঠাদি আইলেন যত জ্ঞানীমুনি।"

বশিষ্ঠও ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ছিলেন, এবিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ বা মতভেদ নাই। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য যে-সমস্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

বল্মীকিশ্চ মহাযোগী বল্মীকাদভবৎ কিল।
অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ঋষী॥
রেতঃ সিষিচতুঃ কুম্ভে উর্ব্বশ্যাঃ সন্নিধৌ দ্রুতম্।
রেবত্যাং মিত্র উৎসর্গমরিষ্টং পিপ্পলং ব্যধাৎ॥"

(ভাঃ ৬।১৮।৫-৬)

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের প্রথম অর্থাৎ ৫ম শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদের* নিরপেক্ষ টীকায় প্রকাশ—

"বল্মীকাৎ বাল্মীকির্ব্বরুণস্যৈব পুত্রোঽভবৎ। এতৌ বরুণস্যাসাধারণৌ পুত্রৌ। তথোৎসর্গাদয়ো মিত্রস্যাধারণাঃ। তয়োরেব সাধারণৌ দ্বৌ পুত্রৌ চাহ, অগস্ত্যশ্চ **বশিষ্ঠশ্চ** ঋষি মিত্রাবরুণয়োরভবতাম্॥"

অর্থাৎ স্বামীপাদ ভৃগু ও 'বাল্মীকি' মুনির বৈষ্ণবতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভা দর্শন করিয়া তাহাদিগকে 'অসাধারণ' পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর '**বশিষ্ঠ**' ও অগস্ত্য ব্রহ্মজ্ঞানী

---

*শ্রীধরস্বামীপাদ পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব হইলেও অদ্বৈতবাদিগণ বলেন তিনি তাঁহাদের সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট আচার্য্য।

বা মায়াবাদী ছিলেন বলিয়া সাধারণ পুত্র মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। দ্বিতীয় অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্লোকে বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া তৎসান্নিধ্যে বরুণের রেতঃ স্খলিত হয় এবং ঐ রেতঃ কুম্ভমধ্যে স্থাপিত হইলে বরুণের বশিষ্ঠ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং বশিষ্ঠ উর্ব্বশীর সন্তান বলিয়া পরিচিত হইলেন। এজন্যও হয়ত শ্রীধরস্বামীপাদ তাঁহাকে সাধারণ পুত্র বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকিবেন। বশিষ্ঠ-মুনি জ্ঞানপথে বিচরণ করিয়া তাঁহার আশ্রমে নির্ভেদ ব্রহ্মের কথা শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেছিলেন। দশরথ-গৃহে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে জানিয়া, তাঁহার স্বরচিত 'যোগ-বাশিষ্ঠ' গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তমূলক তাঁহার স্তব করিয়া-ছিলেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কুলগুরু হইলেও তাঁহাতে ঐপ্রকার মায়াবাদ জ্ঞানাবস্থান দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের দর্শনে বশিষ্ঠ তাঁহার মঙ্গলের পথ খুজিয়া পাইলেন—অদ্বৈত চিন্তাস্রোত শ্লথ হইয়া পড়িল এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় তিনি আত্ম-নিয়োগ করিলেন। এইরূপে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ ধ্বংস হইয়া বৈষ্ণব বিজয় হইয়াছিল।

রাবণ

মধ্ব-সম্প্রদায়ে একটী প্রবাদ আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে যে, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের জ্ঞানিগণ বেদান্তের অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের আদিভাষ্যকার লঙ্কাপতি দশাননকেই জানেন; সুতরাং রক্ষ-

কুলপতি রাবণকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। রাবণের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"পুলস্ত্যবংশীয় জনৈক ঋষি ব্রহ্মাবর্ত্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক লঙ্কাদ্বীপে কিয়ৎকাল বাস করেন। রক্ষ-বংশের কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাবণবংশের উৎপত্তি করেন। ইহাতে রাবণকে অর্দ্ধরক্ষ ও অর্দ্ধ ঋষি বলা যাইতে পারে।"

উক্ত বাক্য হইতে মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রবাদটীও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় যে, রাবণ একজন রাক্ষস হইলেও ঘোর মায়াবাদী ঋষি ছিলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'লঙ্কাবতার-সূত্র' হইতেও জানা যায় যে, রাবণ একজন অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদী ব্রাহ্মণ। এতদ্ব্যতীত রাবণের ক্রিয়া-কলাপ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন প্রধান অদ্বৈতবাদী। ব্রহ্মের শক্তি অপহরণ করিয়া তাঁহাকে নিঃশক্তিকরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টাই অদ্বৈতবাদিগণের মূল মন্ত্র। তাহার প্রধান কারণ পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের শক্তি সীতাদেবীকে হরণ করিবার চেষ্টাই রাবণান্তঃকরণে পরিদৃষ্ট হয়। মায়াবাদী রাবণ তাঁহার শিষ্যানুচর-বর্গের সাহায্যে মায়াসীতা হরণ করিবার যোগ্যতা-মাত্র দেখাইয়াছিল। ভগবৎ-শক্তি গ্রহণ করিতে পারিলে সেই শক্তির আনুগত্যে ভগবৎ-সেবা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিত। মায়াবাদ মন্ত্র সোঽহং-তত্ত্বরূপে রাবণের সীতা সম্পর্কে রামচন্দ্রের পদবী-গ্রহণ করিবার বাসনা নষ্ট হইয়া যাইত। তাই দেখা

যাইতেছে, উক্ত প্রবাদ শুধু প্রবাদ নহে,—প্রকৃত সত্য ; এবং রাবণ সত্য-সত্যই অদ্বৈতবাদী। পরম ভক্ত হনুমান রাবণ-হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ মুষ্ঠ্যাঘাত করায় তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান লোপ হওয়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরে রামচন্দ্রের বেদ-ধ্বনিরূপ বাণে নির্ব্বাণ-দশকশীর্ষ ছিন্ন হইয়া গেল। দশানন তখন শ্রীরামচন্দ্রের স্তবস্তুতি করিয়া নিজ সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ত্রেতাযুগেও ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া মায়াবাদী রাক্ষসের বিনাশ ও অদ্বয়বাদী ঋষির উদ্ধার করিয়াছিলেন। **এইরূপে ত্রেতাযুগেও মায়াবাদের বিনাশ সাধিত হইয়া বৈষ্ণবের ভক্তিসিদ্ধান্তের বিজয়-পাতকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল।**

দ্বাপরযুগে অদ্বৈতবাদ ও তাহার পরিণতি
'শ্রীশুকদেব'

শ্রীল ব্যাসদেব জাবালি কন্যা বীটিকাকে দত্তক-রূপে গ্রহণ করেন। (তৎকালে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল)। তিনি উহার সহিত বহুকাল তপস্যা করেন। পরে পুত্র কামনায় ব্যাসদেব বীটিকাতে বীর্য্যাধান করেন। ফলে গর্ভসঞ্চার হইয়া ব্যাসদেবের পুত্ররূপে শ্রীশুকদেব দ্বাদশবর্ষ কাল বীটিকার গর্ভাবাসে থাকার পর ভগবদাদেশে ও ব্যাসের অনুরোধে মাতার ক্লেশ নিবারণ করিয়া মায়া-মুক্তাবস্থায় (শুকদেব) ভূমিষ্ঠ হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শুকপক্ষীর ন্যায়

ভগবানের স্তব করার দরুণ তিনি শুক নামে পরিচিত হইলেন। শুকের এইপ্রকার জন্মকাহিনী ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে বিষদ্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের ৯।১১।২৫ শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা আলোচ্য, যথা—

"বিচিন্ত্য মনসা চক্রে ভার্য্যাং জাবালিকন্যকাম্"। বীটিকাখ্যাং দদৌ তস্মৈ সোঽপি বৈখানসাশ্রমী। ততশ্চ ব্যাসস্তয়া সহ বহুকালং তপস্তেপে, তদন্তে তস্যাং বীর্য্যমাধত্ত। সা চ গর্ভবতী একাদশসু বর্ষেষু ব্যতীতেষ্বপি ন প্রসূতে স্ম। অথ দ্বাদশে বর্ষে ইত্যাদি ইত্যাদি। * * * অতো গর্ভান্নিসৃত্য প্রণম্য বহুস্তুবানং ত্বং দৃষ্ট্বা ভগবনাহ—"ব্যাস! ত্বদীয় তনয়ঃ শুকবন্মনোক্তং ব্রূতে বচো ভবতু তচ্ছুক এব নাম্নেতি।"

এই শুকদেবই অভিসপ্ত পরীক্ষিৎ মহারাজকে ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন। হরিবংশোল্লিখিত ব্যাসপুত্র শুক —অন্য শুক। **ইনি অরণী হইতে জাত এবং ছায়াশুক নামে খ্যাত। পরীক্ষিতের সহিত এই শুকের কোন সংশ্রব নাই।** বীটিকাসুত শুক নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। ইনি নির্গুণ ব্রহ্ম-জ্ঞানে মগ্ন থাকিলেও ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীশ্রীব্যাসদেব তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের শুষ্ক তপস্যা হইতে নিরস্ত করিয়া শুদ্ধ ভগবজ্‌-জ্ঞানের সহজ সরল ভক্তিতত্ত্বে আনয়ন করেন। শ্রীশুকদেব স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার নিজের যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, পর পৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম-সম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ-শ্লোক-লীলয়া।
গৃহীত-চেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥

(ভাঃ ২।১।৮-৯)

অর্থাৎ পরীক্ষিৎ মহারাজকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী স্বয়ংই বলিয়াছেন,—হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকিলেও উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলা-দ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে আমি দ্বাপর অন্তে আমার পিতা দ্বৈপায়নের নিকট এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি।

সুতরাং শুকদেব নির্গুণ ব্রহ্মের ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও ব্যাসের কৃপায় তৎপথ হইতে উত্তমঃশ্লোক ভগবৎলীলা আলোচনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন। এবং ভগবল্লীলা-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত-প্রসঙ্গই জীবের একমাত্র চরম কল্যাণকর জানিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজকে ভাগবতোপদেশ করিয়াছিলেন। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলেন নাই ; কারণ ইহাতে পরীক্ষিতের বা অন্য কাহারও মঙ্গল হইবে না। এইরূপে **শ্রীশুকদেব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য হইয়াছিলেন।**

'কংস'

অসুর-কুলতিলক কংশ উগ্রসেন রাজার ঔরসে ও পদ্মার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উগ্রসেন দেব-ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া

তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখিয়া কংশ নিজেই তাহার স্থানে রাজত্ব করেন। উহার খুল্লতাত দেবক-দুহিতা দেবকীর সহিত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বসুদেবের বিবাহ হয়। 'বিশুদ্ধ-সত্ত্বে ভগবদ্বিগ্রহের প্রকাশ হইবে' এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নাস্তিক কংস ভগবদ্বিগ্রহ বিনাশের কৌশল কল্পনা করিয়া দেবকী-দেবীকে কারারুদ্ধা করেন। মায়াবাদিগণ বিগ্রহ বিরোধী। ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত আকার নাই, ইহাই তাহাদের দর্শন শাস্ত্রের বিচার। শরীর পরিগ্রহ করাই মায়ার ধর্ম্ম, ইহা শঙ্করের শারীরিক সিদ্ধান্ত; এবং তাঁহার যে কোন উপায়ে হউক বিনাশ সাধনই মোক্ষ। দেবকীর অষ্টম গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংশের ন্যায় প্রাকৃত বা মায়িক (?) শরীর পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইতেছেন—এইরূপ মনে করিয়া কংশ তাঁহার বিনাশ সাধনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ কখনও মায়িক শরীর পরিগ্রহ করন নাই বা করেন না—ইহা কংশের অজ্ঞাত। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর" ইহাও তাহার জানা ছিল না। মায়াবাদী কংশের ভগদ্বিগ্রহের প্রতি অসূয়া দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাকে ও তাহারই শিষ্যানুচর প্রলম্ব, তৃণাবর্ত্ত, অঘ-বক-পুতনাদি অসুরগণকে বিনাশ করিয়া শ্রীবিগ্রহের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই—কংশ ও প্রলম্বাসুর প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ও মায়াবাদী নাস্তিক। কৃষ্ণ ও বলদেব তাহাদের বিনাশ করিয়া তদ্‌যুগীয় জীবসমূহকে নাস্তিক্য মায়াবাদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

"দৈবকীমগৃহীৎ কংশ নাস্তিক্য-ভগিনীং সতীং।"
"প্রলম্বো জীবচৌরস্তু শুদ্ধেন শৌরিণা হতঃ।
কংশেন প্রেরিতো দুষ্টঃ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ রূপধৃক্॥"
(কৃঃ সঃ ৪।৩০)

অর্থাৎ বসুদেব 'নাস্তিক্যের প্রতিমুর্ত্তি কংশের' ভগিনী দেবকীদেবীকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সেই কংশের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মায়াবাদস্বরূপ জীবচৌর দুষ্ট প্রলম্বাসুর শুদ্ধ সৌরি বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল।

উক্ত শ্লোকে 'জীবচৌর' শব্দের সার্থকতা এই যে, বৌদ্ধও মায়াবাদমতে ব্রহ্ম অবিদ্যাগ্রস্ত হইলেই বিগ্রহ স্বীকার করেন, এবং এই অবিদ্যাগ্রস্তের অবস্থাই জীবস্বরূপ। এই স্বরূপের অর্থাৎ বিগ্রহের অপনোদন বা অপহরণই চৌরত্ব। উক্ত অসুরগণের বিগ্রহ বিনাশ ও জীবত্ব হরণ করাই তাহাদের স্বরূপগত স্বভাব ছিল, বলিয়া উহারা মায়াবাদী নাস্তিক এবং জীবচৌর। অথবা জীবত্ত্ব বলিয়া কিছুই নাই, সবই ব্রহ্ম; সুতরাং অদ্বৈতবাদী জীবচৌর হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম উহাদের দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিয়া তাহাদের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। **এইরূপে দ্বাপর যুগেও অদ্বৈতবাদের বা মায়াবাদের বিনাশ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল।**

যুগত্রয়ে অদ্বৈতবাদের পরিণাম

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগেই ভগবদিচ্ছাক্রমে মায়াবাদের অভ্যুত্থান ও বিনাশ সাধিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয় হইয়াছিল। উক্ত যুগত্রয়ের আরও অনেক ঋষি ও রাক্ষস বা অসুর অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উক্ত দুই শ্রেণীর ভিতরে যাহারা প্রধান ছিলেন, তাহদেরই জীবনী উল্লেখ করিয়া ফলাফল নির্দ্দেশপূর্ব্বক আপনাদের সমক্ষে মায়াবাদের জীবনীর আভাষমাত্র ব্যক্ত করিলাম। ভগবান্ অদ্বৈতবাদী ঋষিগণকে পরমকৃপা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়া নিজসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এবং মায়াবাদী অসুর ও রাক্ষসগণকে কৃপাবশতঃ বিনাশ করিয়া মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এইজন্যই স্বয়ং ভগবান্ 'মুক্তিপদ' নামে পূজিত হন। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে **প্রাগৈতিহাসিক যুগের মায়াবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ বর্ত্তমান যুগের শঙ্কর প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ এক নহে।** বর্ত্তমান মায়াবাদ অত্যন্ত আধুনিক ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং ব্যাস-বিরুদ্ধ। ভগবান্ অদ্বৈতবাদী অসুরগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া যে সাযুজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত আসুরিক ও ক্লেশকর গতি হইলেও আত্যন্তিক নির্ব্বিশেষের তুল্য মিথ্যা অবস্থা নহে। কারণ সেই মুক্তপুরুষের স্বতন্ত্র-অবস্থা নষ্ট হয় না। পুনরায় তাহাদের আবির্ভাব শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। **আচার্য্য শঙ্করের 'মুক্তি' কাল্পনিক ও মিথ্যা অর্থাৎ ইহার পারমার্থিক সত্যতা নাই।**

আধুনিক মতে কালের বিভাগ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিচারে অথবা তন্মতবাদে অনুপ্রাণিত ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের ও অক্ষজবাদী জ্যোতিষিগণের বিচারে যুগত্রয়ের স্থিতিকাল ও বর্ত্তমান কলিযুগের যে কাল অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও কাহারও মতে আনুমানিক ৭৫০ বৎসর মাত্র। উক্ত মতবাদের ভিতর প্রবিষ্ট না হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও ভারতীয় জ্যোতিষিগণের মতের কিয়তপরিমাণে সামঞ্জস্য করত বিচার করিয়া দেখিলে কালগত বিচারে অসুরগণের বিনাশ ও মোহানার্থে ভগবানের আবির্ভাবের একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষণে সেই ধারার একটী মোটামুটী বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। সত্যযুগের আবির্ভাবের আনুমানিক ৫০০ বৎসর গত হইলে ভগবানের **শেষাবতার** এবং **হংসাবতার** সমূহের আবির্ভাব হয়। হংসাবতারের (১০০০) এক সহস্র বৎসর পরে ত্রেতাযুগে **শ্রীরামচন্দ্রের** অধিষ্ঠান কাল। শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের (১০০০) এক সহস্র বৎসরের মধ্যে দ্বাপরের শেষে **শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের** আবির্ভাব। সুতরাং দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ২৫০০ বৎসর গত হইলে পর, কলিযুগ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণের তিরোভাবের (১০০০) এক সহস্র বৎসর পর অর্থাৎ "কলৌ সংপ্রাপ্তে" অর্থাৎ কলি সম্যক্-রূপ প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধ বা বিষ্ণুবুদ্ধ অর্থাৎ **আদিবুদ্ধের** আবির্ভাব হয়। তাহার এক হাজার (১০০০) বৎসর পরে **শাক্যসিংহ বুদ্ধ** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার (১০০০) এক সহস্র বৎসর পরে

ন্যূনাধিক ৫০০ শত খৃষ্টাব্দে **আচার্য্য শঙ্করের** আবির্ভাব হয়। তাঁহার এক সহস্র (১০০০) বৎসর পরে ন্যূনাধিক ১৫০০ শত খৃষ্টাব্দে (১৪৮৬) সমস্ত অবতারগণের মূলপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর** প্রকটকাল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের-লীলা সম্বরণের পর ন্যূনাধিক ৪৬৮ শত বৎসর অতীত হইতে চলিল।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে হংসাবতার হইতে কৃষ্ণ-বলরাম পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসর। কৃষ্ণ হইতে শাক্যসিংহ বুদ্ধ পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসর। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইতে শ্রীচৈতন্য-দেব পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসর। দ্বাপর যুগের কৃষ্ণাবতার পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসরের মায়াবাদের জীবনী পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিয়াছি। বর্ত্তমান যুগের প্রথম ২০০০ সহস্র বৎসর অর্থাৎ শাক্যসিংহ বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মায়াবাদের প্রতাপ পরিলক্ষিত হয় না। কৃষ্ণবলরামই কল্যারম্ভের পূর্ব্বে উহাদের বিনাশ সাধন করার ফলে এবং তৎপরে আদিবুদ্ধের অসুরমোহন লীলার প্রকটনফলে মায়া-বাদিগণ এই ২০০০ সহস্র বৎসর বৈষ্ণবগণের প্রতি কোন-রূপ উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হয় নাই।

‘শাক্যসিংহ’

ভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য আদি-বুদ্ধ অর্থাৎ ‘নবম অবতার বুদ্ধের’ বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যের জন্য মায়াশক্ত্যাবেশে ‘শাক্যসিংহ-বুদ্ধ’ খৃষ্টপূর্ব্ব ন্যূনাধিক ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে

জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে ৪৭৭ এবং কাহারও মতে ৫৪০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি আবির্ভূত হন। এই সময় হইতে মায়াবাদ-চিন্তাস্রোত বহুকালের বান্ধ ভাঙ্গিয়া অতি প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গৌতমের আবির্ভাব হইতে শঙ্করের আবির্ভাব পর্য্যন্ত ১০০০ বৎসর কাল এই চিন্তাস্রোতটী নানা প্রকার আকার ধারণ করিয়া আস্ফালন করিতেছিল। আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ বৌদ্ধবাদের নামান্তর মাত্র—আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এই সম্বন্ধে নৈষ্ঠিক অদ্বৈতবাদী শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থের ভূমিকার ১০ম পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহা পুনরায় উল্লেখ করিতেছি—

"বুদ্ধদেবের পর প্রায় ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য-রাজের (৫৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ) আবির্ভাব পর্য্যন্ত **'অদ্বৈতমত' 'বৌদ্ধমতের মধ্য দিয়াই প্রবলভাবে প্রচলিত হইতে থাকে।"**

তাঁহার মতে বিক্রমাদিত্যের পর ৫০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শঙ্করের অদ্বৈতমত বৌদ্ধগণের হস্তে নিহিত ছিল। তিনি উক্ত ভূমিকার ৯ম পৃষ্ঠায়ও লিখিয়াছেন—

"এইরূপে এই সময় **অদ্বৈত চিন্তাস্রোত বৌদ্ধগণের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে বহিতে থাকে।"**

(ঘোষ মহাশয়ের উল্লিখিত উক্তি হইতে তাঁহাকে আমরা নিঃশঙ্কোচে "বৌদ্ধ মায়াবাদী" বলিয়া জানিতে

পারিলাম। আমার মনে হয় ইহাই তাঁহার ঠিক পরিচয়। ইহাতে রাজেন বাবু যে অন্তরে অন্তরে একজন পাকা বৌদ্ধ ছিলেন তাহা তিনি 'হাতে কলমে' ধরা না দিলে তাঁহাকে জনসাধারণের চিনিতে অনেক বেগ পাইতে হইত।) এক্ষণে মায়াবাদের বিভিন্ন মূর্ত্তির সামান্য পরিচয় এতৎস্থলে না দিলে মায়াবাদ-জীবনের অঙ্গহানি হইবে মনে করিয়া নিম্নে তাহার আভাস প্রদত্ত হইতেছে।

'দর্শন সপ্তক'

চার্ব্বাকের **নাস্তিক্য**; কণাদের **বৈশেষিক**; গৌতমের **ন্যায়**; কপিলের **সাংখ্য**; পতঞ্জলির **যোগ** ও **জৈমিনীর মীমাংসা**; জিনের **জৈন** বা অর্হৎ; এই দর্শন সমূহ—সাত প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করত অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তকে গলাধঃ-করণের জন্য আস্ফালন করিতেছিল। দর্শক সপ্তকের উক্ত মূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকটীই মায়াবাদী। কারণ প্রকৃতই মায়া। প্রাকৃত মায়িক বস্তু লইয়াই যাহাদের বাদ-বিতণ্ডা ও দর্শন-শাস্ত্রের পরিপুষ্টি তাহারাই মায়াবাদী। উক্ত দর্শনসমূহ পরস্পর বুদ্ধ ও শঙ্করের মধ্যবর্ত্তীকালে বহু প্রবল হইয়া উঠার দরুণ কেহ কাহারও শ্রীবৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া পরস্পর তর্ক বিতর্ক ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ শক্তিক্ষয় করিয়াছে। তৎফলে সৌভাগ্যক্রমে চার্ব্বাকের নাস্তিক্যদর্শন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অর্হৎ বা জৈনগণও প্রায় তদ্রূপ অস্তিত্বহীন হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদের ঐ প্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া প্রমাদ গণিলেন এবং পরস্পর গৃহবিবাদের একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের উপায় সৃজন করিলেন। শঙ্কর উক্ত মত সমূহের কতকগুলি যুক্তি গ্রহণ করিয়া এবং কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সামঞ্জস্য করিবার অভিনয় দেখাইয়া স্বমতের পুষ্টি করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত সাতটী দর্শন এবং বুদ্ধের শূন্যবাদ ও শঙ্কর কথিত ব্রহ্মবাদ সর্ব্বসমেত নয়টী দর্শন সমুদয়ই মায়াবাদ-শ্রেণীভুক্ত। পূর্ব্ব-কথিত সাতটী দর্শনকে মায়াবাদী বলিবার বিস্তৃত কারণ প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে বলিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। আবশ্যক হইলে প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে।

'ভর্ত্তৃহরি'

শ্রীল শঙ্করের আবির্ভাবের ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভর্ত্তৃহরি উপনিষদ্ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া মায়াবাদের এক নূতন ধারা জগতে প্রবাহিত করেন। তিনি বৌদ্ধযুক্তি অবলম্বন করিয়া উপনিষদ সমূহের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াই উপনিষদ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন এবং হিন্দু ধর্ম্মের নামে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জগতে প্রচলিত করিবার জন্য যত্ন করেন। ভর্ত্তৃহরি বৌদ্ধ অমরসিংহের সমসাময়িক। তিনি বৌদ্ধ শবর স্বামীর ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। অমরসিংহ উক্ত শবর স্বামীর শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান—পূর্ব্বে ইহা আমরা জানাইয়াছি। সুতরাং উভয়েই

উভয়ের ভ্রাতা। অমরসিংহ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। আচার্য্য শঙ্কর ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থাদি হইতেও তাঁহার মায়াবাদ—অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধ মত প্রচার করিবার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। ভর্ত্তৃহরির উপনিষদ্‌-সম্প্রদায় বৌদ্ধ-মায়াবাদেরই প্রচারক ছিল—ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

মায়াবাদের প্রকৃত স্বরূপ

'গৌড়পাদ'

মায়াবাদের ইতিহাস আলোচনার মধ্যে গৌড়পাদের ইতিহাস প্রধানতঃ আমাদিগকে আলোক প্রদান করিবে। সুতরাং তাঁহার জন্ম-কর্ম্মাদি এবং তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহের অনুসন্ধান করিয়া বিচার করা যাইতেছে। আচার্য্য শঙ্করের সহিত ইঁহার অতি নিকট সম্বন্ধ।—শুধু তাহাই নহে, শঙ্করের যাহা কিছু সিদ্ধান্ত, সমস্ত এই গৌড়পাদের বিচারের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ এবং তাঁহার গুরু গৌড়পাদ। অতএব গৌড়পাদ শঙ্করেই পরমগুরু। গৌড়পাদকে কেহ কেহ গৌরপাদ বলিয়া থাকেন। গোবিন্দ-পাদেয় কোনও গ্রন্থাদি নাই। গৌড়পাদই প্রকৃত প্রস্তাবে শঙ্করাচার্য্যের গুরু। শঙ্করযুগে মায়াবাদ যে-প্রকার ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে ভারতীয় সনাতন-হিন্দুসমাজ 'মায়াবাদী' বলিতে একমাত্র শঙ্কর ও তাঁহার অনুগত জনগণকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু

জানিতে হইলে, তাঁহার যিনি প্রকৃত গুরু বা আদর্শ শিক্ষাগুরু, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু জানা বিশেষ আবশ্যক। হরিবংশে আছে,—

পরাশরকুলোৎপন্নঃ শুকো নাম মহাযশাঃ।
ব্যাসাদরণ্যাং সংভূতো বিধুমেঽগ্নিরিব জ্বলন্॥

স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং বীরিণ্যাং জনয়িষ্যতি।
কৃষ্ণং গৌড়ং প্রভুং শ্রম্ভুং তথা ভুরিশ্রুতং জয়ম্॥

কন্যাং কীর্ত্তিমতীং ষষ্ঠীং যোগিনীং যোগমাতরম্।
ব্রহ্মদত্তস্য জননীং মহিষী মনুহস্য চ॥

অর্থাৎ পরাশরের পুত্র ব্যাস, ব্যাসের পুত্র শুক, শুকের পুত্র গৌড়, এবং শুকের কন্যা মহিষীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন।

কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতে "শুক কন্যায়াং ব্রহ্মদত্তম্ অজিজনৎ॥" এইরূপ দেখিয়া পরীক্ষিতের উপদেশকারীই এই শুক বলিয়া ভ্রম করেন। তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, ভাগবত ব্যাখ্যাকারী শুক, জাবালি কন্যা বীটিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আকুমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই **অবিবাহিত শুকের কোন কন্যা থাকিবার সম্ভাবনাই নাই। হরিবংশীয় শুক সম্বন্ধেই গার্হস্থ্যাদি ব্যবহার আছে।** শ্রীল শ্রীধর গোস্বামিপাদের উক্ত বাক্যের টীকা হইতে জানা যায়—**এই গৃহস্থ শুকের অন্য নাম 'ছায়াশুক'।** তাঁহার টীকার প্রাসঙ্গিক অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"যদ্যপি শুক উৎপত্ত্যেব বিমুক্তসঙ্গো নির্গতস্তথাপি বিরহাতুরং ব্যাস মনুষাস্তং দৃষ্ট্বা (ছায়াশুকং) নির্ম্মায় গতবান্। তদভিপ্রায়ে-

সৈবায়ং গার্হস্থ্যাদি ব্যবহারঃ ইত্যবিরোধঃ। স চ ব্রহ্মদত্তো যোগী গবি বাচি সরসত্যাম্।”

দেবী ভাগবতে এই **ছায়াশুকেরই পুত্ররূপে শ্রীগৌড়পাদের নাম** উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন--গৌড়পাদ তাঁহার পিতা ছায়াশুকেরই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ছায়াশুকের পিতা ব্যাস নামে কোন ব্যক্তি একদা ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, অরণি গর্ভে বা অরণ্যে শুক্র নিক্ষেপ করিয়া ছায়াশুকের জন্মদান করেন। এই শুক তাঁহার পিতৃকন্যা অর্থাৎ সহোদরা ভগ্নী বীরিণির গর্ভে আচার্য্য শঙ্করের পরম গুরু গৌড়পাদের জন্মদান করিয়াছিলেন। এইরূপে কলিকালে গৌড়পাদ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় তদানিন্তনকার জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সাংখ্যকারিকা ও মাণ্ডুক্যকারিকা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি॥ উক্ত কারিকা দ্বয়ই মায়াবাদের জীবাতু।

‘গুরুর মত খণ্ডন’

আচার্য্য শঙ্কর গৌড়পাদের উক্ত কারিকাদ্বয় অবলম্বন করিয়াই তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। প্রসিদ্ধ মায়াবাদী বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করের প্রায় সমকালীন লোক। তিনি উক্ত গৌড়পাদের সাংখ্য কারিকার তত্ত্বকৌমুদী নামে টীকা রচনাকালে গৌড়পাদের কারিকার খণ্ডন করেন। এই সম্পর্কে একান্ন (৫১) কারিকার টীকা দ্রষ্টব্য। মায়াবাদিগণ সাধারণতঃ যাহার উপর নির্ভর করে তাহাকেই ধ্বংস করিয়া থাকে অর্থাৎ বৃক্ষের যে ডালে বসে সেই

ডালটীই কাটিয়া ফেলে। আচার্য্য শঙ্কর ব্যাসসূত্রের শারীরিক ভাষ্য করিতে গিয়া তিনিও উক্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলিতে গেলে "ব্যাস ভ্রান্ত বলি' এক উঠাইল বিবাদ"—এইরূপ বলিতে হয়। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে দুই একটী প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে।

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রঃ সূঃ- ১।১।১২) সূত্রের "আনন্দময়" শব্দের স্বমতে ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া, উক্ত দ্বাদশ সূত্র হইতে একোনবিংশ সূত্র পর্য্যন্ত যেরূপ ভাষ্য করিয়া বাক্য-বিন্যাস করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ব্যাসের উক্ত সূত্রের সঙ্গতি করিতে না পারিয়া তাহার (সূত্রের) দোষ দর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যৎ কারণমভ্যাসাদিতি স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতম্ 'তদ্ধে-তুব্যপদেশাচ্চ' সর্ব্বস্য চ বিকারজাতস্য আনন্দময়স্য কারণত্বেন ব্রহ্মব্যপদিশ্যতে।"

ভাবার্থ এই যে, "শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই অভ্যাস কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মই (আনন্দই) সবিকার ব্রহ্মের (আনন্দময়ের) কারণ। সুতরাং উক্ত দ্বাদশ সূত্র ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। এবং উহা 'আনন্দময়' এইরূপ না হইয়া 'আনন্দ' এইরূপ হওয়াই সঙ্গত।" এইরূপ বলিয়া সূত্রে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া—

"অস্য চ যুক্তাযুক্তত্বে সুবিভিরেবাবগন্তব্যে ইতি কৃতং পর-দোষাদ্ভাবনেন নঃ সিদ্ধান্তমাত্র-ব্যাখ্যান-প্রবৃত্তানামিতি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গৌড়পাদের কারিকার খণ্ডন করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার ব্যাখ্যা লিখিতে বসিয়াছেন, তাহারই দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। আচার্য্য চিদ্বিলাসও শ্রীহর্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন। উহারা উভয়েই শঙ্করপন্থী মায়াবাদী।

শঙ্কর মতে গুরু যখন ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য অবিদ্যাগ্রস্থ, অর্থাৎ অনবগত মূর্খ, তখন গুরুর দোষ দর্শনে আর আপত্তি কি? যে গুরুকে শাস্ত্রে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈঃ" বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহাকে শঙ্কর বলেন—'অনবগতৌ ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ'।

(অজ্ঞানবোধিনী)

শঙ্করের জন্ম

মায়াবাদৈকসংরক্ষক, শূন্যবাদপৃষ্ঠপোষক, অধুনাতন অদ্বৈত-বাদ প্রবর্ত্তক ও মায়াবাদিকুলতিলক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের জীবন বৃত্তান্ত বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের সকলেই স্বল্পবিস্তর অবগত আছেন। শঙ্করের জীবনী সম্বন্ধে তৎতৎ সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ শঙ্কর-বিজয়, শঙ্কর-দিগ্বিজয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে শঙ্করের সম্বন্ধে বহুকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধ্ব সম্প্রদায়ও মধ্ব-বিজয়, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি তৎসম্প্রদায়ের প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহেও শঙ্করের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বহুকথার আলোচনা রহিয়াছে। শাঙ্করগণ মাধ্বগণের বিরোধী এবং মাধ্বগণও শাঙ্করগণের

বিরোধী। উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ আলোচনা দ্বারাই আচার্য্যের জীবন-বিবরণ সুষ্ঠুভাবে জানা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহই প্রামানিক বলিয়া পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত আছে। তাহা ছাড়া আরও অনেক বাঙ্গালায় লিখিত শঙ্কর গ্রন্থাদি হইতেও আচার্য্য শঙ্করের জীবনী জানা যায়। সুতরাং শঙ্কর সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিতে চাহি না। শঙ্করের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে বহুমত প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে আমার অনুমান হয়, তিনি ন্যূনাধিক ৭০০ শত খৃষ্টাব্দে কেরল দেশের অন্তর্গত 'চিদম্বর' নামক গ্রামে 'বিশিষ্টা' নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'বিশ্বজিৎ' বিশিষ্টার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বজিৎ অপুত্রক হওয়ায় মনের দুঃখে বিশিষ্টাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। বিশ্বজিৎ পরে 'শিবগুরু' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বিশিষ্টা একাকিনী গৃহে থাকায় চিদম্বরের গ্রাম্য দেবতা শ্রীশিবমন্দিরের সেবাইতকে গুরুরূপে বরণ করিয়া মহাদেবের দৈনন্দিন সেবায় তাঁহার দেহ মন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি গর্ভধারণ করিলেন। তাঁহার গর্ভধারণ বার্ত্তা লোকসমাজে প্রচারিত হইলে তদ্‌গ্রামবাসী নৈতিক সামাজিকগণ তাঁহাকে দুর্নৈতিকা ভ্রষ্ট-চরিত্রা মনে করিয়া সমাজচ্যুত করিলেন। বিশিষ্টা লজ্জা, অপমান ও লোকাপবাদে মর্ম্মাহত হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় তাঁহার পিতা মঘমণ্ডনের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, 'বিশিষ্টার গর্ভে শঙ্কর

অবস্থান করিতেছেন, সাবধান যেন তাঁহার মৃত্যু না হয়।' বিশিষ্টার পিতা মঘমণ্ডন স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কন্যাকে আত্মহত্যা হইতে নিরস্ত করিলেন এবং তাঁহার যথোচিত যত্নে আচার্য্য শঙ্কর নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য শঙ্কর উপনয়নের পূর্ব্বেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন হইলেই বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। তিনি গুরুমুখে যাহা শুনিতেন তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। শঙ্কর সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া ষড়্‌দর্শন ও উপনিষদ্ পাঠ করেন। কথিত আছে তাঁহার সংসারে আস্থা ছিল না। তিনি অধ্যয়ন ও শিবোপাসনায় সময়াতিপাত করিতেন। একদা শঙ্কর মাতার সহিত গ্রামান্তরে যাইতে একটী ক্ষুদ্র নদীর পরপারে যাইবার সময় স্রোতে ভাসিয়া যাইবার অভিনয় করিতেছিলেন। একমাত্র পুত্রের জননী তাঁহার গর্ভধারিণী এই ঘটনায় বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর বলিলেন 'মাতঃ! তুমি যদি বিবাহের পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বার পরিগ্রহ না করাও এবং আমাকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি আত্মরক্ষা করিব। অগত্যা শঙ্কর-জননী তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং শঙ্কর জল হইতে উত্থিত হইয়া গৃহে আসিলেন।"—

(১৩০৮ সালে প্রকাশিত শিবনাথ শিরোমণি-কৃত শব্দার্থ-মঞ্জরীর পরিশিষ্ট)

আচার্য্যের উক্ত জীবন বৃত্তান্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি মাতাকে শাস্ত্রবাক্যদ্বারা বা নানা প্রবোধ-

বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার জগন্মঙ্গল-কর সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুমতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। মাতাকে ছলনা করিয়া তাঁহার পুত্রবাৎসল্যের সুযোগ লইয়া ক্ষুদ্র নদীতে প্রাণ ত্যাগের অভিনয় দেখাইয়া যতিধর্ম্মের আজ্ঞা লইলেন। অন্য কোনও মহাজনের জীবনীতে এইরূপ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণকালে তাঁহার বৃদ্ধা অসহায়া মাতা শচীদেবী ও তাঁহার প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী বিষ্ণু-প্রিয়াদেবী উভয়কেই বুঝাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সন্ন্যাসের গ্রহণের অনুমতি লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবানের অবতার; আর শঙ্কর তাঁহার ভক্ত শিবের অবতার। এস্থলে বক্তব্য এই যে, আচার্য্য শঙ্কর যে-স্থলে তাঁহার যুক্তি তাঁহাকে স্থাপন করিতে অসমর্থ, সে-স্থলে ছল-চাতুরী, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি নানাপ্রকার অশোভন ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে ক্রুটি করিতেন না। যাহা হউক, ছলে-বলে কলে-কৌশলে সর্ব্বপ্রকারেই কার্য্য উদ্ধারের প্রথা সর্ব্বকালেই দৃষ্ট হয়।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার স্বমতপোষক কতিপয় উপনিষদেরও ভাষ্য রচনা করিয়া তিনি জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য নানাদেশে দিগ্বিজয়-কল্পে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয়-কাহিনীর দুই একটী কথা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

শঙ্কর বিজয়

(ক) শঙ্করের জীবনী পড়িলে জানা যায় তাঁহার সহিত বহু স্মার্ত্ত, শৈব, শাক্ত ও কাপালিকদের বিচার হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র-দেশবাশী **'উগ্রভৈরব'** নামে এক কাপালিক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, শঙ্কর তাহার চিত্ত শোধন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ পূর্ব্ব চুক্তি মতে তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক নিজ মস্তক দান করিয়াছিলেন। আচর্য্য **পদ্মপাদ** তাঁহাকে সেই কাপালিক উগ্রভৈরবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া-ছিলেন। ইহাতে দেখা যায় শঙ্কর কাপালিকের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহার ধর্ম্মের যৌক্তিকতায় মস্তক দান করিতে বা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(খ) কর্ণাটদেশে **'ক্রকচ'** নামে এক ব্যক্তি কাপালিক-গণের গুরু ছিল, শঙ্কর বিচারে তাঁহাকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া উজ্জয়িনীর তদানীন্তন রাজা 'সুধন্বা' দ্বারা পাশব বল-প্রয়োগে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। শঙ্করের যোগবল ও যুক্তিবল এক্ষেত্রে কোন কার্য্যকরী হয় নাই।

(গ) **'অভিনবগুপ্ত'** নামে জনৈক শাক্তাচার্য্যের সহিত আচার্য্য শঙ্করের উক্ত মতবাদ লইয়া বিচার উত্থাপিত হয়। তাহাতে অভিনবগুপ্ত শঙ্করের প্রভাবে ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শঙ্কর উক্ত মতবাদের দ্বারা তাঁহার শিষ্যের চিত্ত শোধনে সমর্থ হন নাই। কারণ অভিনবের ষড়যন্ত্রে তিনি উৎকট ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন

বলিয়া প্রবাদ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় অন্যের দ্বারা ঐরূপ রোগাক্রান্ত হওয়ার নিদর্শন চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকগণ কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। যাহা হউক, অভিনবের চরিত্রে ঐরূপ দোষারোপের দ্বারা মনে হয়, তিনি শঙ্করের **'ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ'** হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিলেও যুক্তি তর্কে তাঁহার সহিত মিল হইত না। এই জন্যই তাহার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়া **'পদ্মপাদ'** উক্ত অভিনবগুপ্তের প্রাণ বিনাশ করেন।

(ঘ) শঙ্কর যখন উজ্জয়িনীতে গিয়াছিলেন, তখন আচার্য্য **'ভাস্করে'র** সহিত তাঁহার মায়াবাদ সিদ্ধান্ত লইয়া নানাপ্রকার বিচার হয়। আচার্য্য ভাস্কর শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক ছিলেন। শঙ্কর কোনক্রমেই তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই। পরন্তু ভাস্করের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন। **ভাস্কর বেদ ও বেদান্তেরভাষ্য রচনা করিয়া শঙ্করমতকে সুষ্ঠু-ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এবং তাঁহাকে মায়াবাদী মাহা-যানিক বৌদ্ধ বলিয়া বেদান্তের ভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।** এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণাদি আমি পূর্ব্বেই (৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) **'শঙ্কর মাহাযানিক বৌদ্ধ'** প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষেত্রে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আচার্য্য ভাস্করক্ষেত্রে তাঁহার স্বমত প্রচার করিতে ত' পারেনই নাই, বরং বিপরীত হইয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল—শঙ্কর মাহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন।

(ঙ) **'উভয়ভারতী'** নাম্নী মণ্ডন মিশ্রের এক মহতী বিদুষী স্ত্রী ছিলেন। আচার্য্য শঙ্করের সহিত তাঁহার স্বামী শ্রীমণ্ডন

মিশ্র বিচারে পরাজিত হইলে পর, তিনি শঙ্করকে পুনরায় বিচারে আহ্বান করিয়া স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য প্রত্যুৎপন্ন মতি প্রভাবে শঙ্করকে রতিশাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বিচারে পরাস্ত করেন। শঙ্কর স্ত্রীলোকের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া মহা বিপদাপন্ন হইলেন। তখন তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া যোগবলে কোনও এক রাজার মৃত-শরীরে প্রবেশ করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় রাজমহিনীগণের নিকট হইতে 'কাম' বা 'রতি' ব্যবহার সম্বন্ধে উভয়ভারতীর যুক্তির প্রত্যুত্তর শিক্ষা করেন। ইহাতেও শঙ্করের অপ্রতিহত দুর্দ্দমনীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিকন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐরূপ রতিক্রিয়ার আলোচনায় যতি-ধর্ম্মের হানি হইল কিনা বিবেচনার বিষয়। আমার মতে কোনও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বা সন্ন্যাসীর যদি স্ত্রীঘটিত রতিক্রিয়ার বিধি-বিধান না জানা থাকে,—তবে তাঁহার পক্ষে প্রশংসারই বিষয় হইয়া থাকে। পরন্তু কোন-ক্রমেই নিন্দনীয় নহে। সুতরাং শঙ্করের ঐরূপস্থলে জয় লাভের চেষ্টা নিতান্ত অশোভন।

(চ) **মণ্ডন মিশ্রই** শঙ্কর বিজয়ের বিজয়ত্ব। মণ্ডন তৎ-কালে একজন স্মার্ত্ত ও কর্ম্ম-মীমাংসায় অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর বিচারে তাঁহাকে জয় করিয়া-ছিলেন। শঙ্করের জয় বৌদ্ধদের মধ্যে (?), কাপালিকের মধ্যে, শাক্তের মধ্যে, স্মার্ত্ত ও কর্ম্মীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মণ্ডন মিশ্রকে জয় করিয়া তিনি যে বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি

ভোগপর কর্ম্মের জয় করিয়াছেন মাত্র। কাপালিকের প্রাকৃত তান্ত্রিক ভৈরবোপাসনা, শাক্তেয় মতবাদিগণের পঞ্চ-ম-কার ও বামা-শক্তির উপাসনা, জৈমিনীর ভোগপর কর্ম্মজড়বাদ ও স্মার্ত্ত-গণের পঞ্চোপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা স্বতঃসিদ্ধ। তৎতৎ ক্ষেত্রে বিজয়াস্ফালনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় নাই। আচার্য্য **'ভাস্কর'** তাহা তৎকালেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(ছ) আচার্য্যের জীবনীতে আরও একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি বিপদাপন্ন হইলেই তাঁহার শিষ্য **পদ্মপাদ** তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনাকাশে পদ্মপাদ পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ। **শঙ্করের শারীরক-ভাষ্য প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই পদ্মপাদ বেদান্তের-ভাষ্য রচনা করেন।** ঐ ভাষ্য তাঁহার মাতুল কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হন। ইহা দেখিয়া আচার্য্য-শঙ্কর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"পদ্মপাদ! তুমি দুঃখিত হইও না, **তোমার সূত্র-ভাষ্যের প্রথম চারিটী সূত্রের ভাষ্য আমি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি শ্রবণ কর।**" ইহাতে দেখা যায় শঙ্কর পদ্মপাদীয় বেদান্ত-ভাষ্য কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁহার নিজের ভাষ্য প্রণয়নের পূর্ব্বেই উহা উদ্গীরণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর যখন সৌরাষ্ট্র-দেশে উপনীত হন, তখনই তাঁহার মায়াবাদিপূজিত বিখ্যাত বেদান্ত ভাষ্য প্রথম প্রকাশিত হয়। পদ্মপাদের যে প্রকার ক্রিয়াকলাপ, পাণ্ডিত্য খ্যাতি শ্রবণ করা যায়, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই শঙ্কর স্বীয় ভাষ্য

রচনা করিয়া থাকিবেন। **এক্ষণে শঙ্করই আদি ভাষ্যকার কি পদ্মপাদই আদি ভাষ্যকার—ইহা বিবেচনার বিষয়।** অন্ততঃ পদ্মপাদ শঙ্করের সর্ব্ববিষয়ে রক্ষক ও অবলম্বন ছিলেন একথা নিঃশঙ্কচে বলা যায়।

(জ) তিব্বতীয় **বৌদ্ধ 'লামার'** সহিত বিচারে শঙ্কর পরাস্ত হন। 'লামা' তখনকার বৌদ্ধ জগদ্‌গুরু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বিচারকালে উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে—**"যিনি পরাস্ত হইবেন তিনিই তপ্ত তৈলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন॥** সুতরাং বিচারে পরাস্ত হইয়া আচার্য্য শঙ্কর উত্তপ্ত তৈলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এ সম্বন্ধে শিরোমণি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"শঙ্কর আচার্য্য বৌদ্ধ জগদ্‌গুরু **তিব্বতের লামার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে উত্তপ্ত তৈল কটাহে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ৮১৮ (?) খৃষ্টাব্দে জগতের উজ্জ্বল জ্যোতি শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ ঘটে।—**

(শব্দার্থ মঞ্জরী পরিশিষ্ট।)

প্রকাশ থাকে যে, আজও তিব্বতে সেই **'শঙ্কর কটাহ'** বিদ্যমান রহিয়াছে। লামাগণ উহা তাহাদের বিজয় বৈজয়ন্তীর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ আদর ও সম্মান করিয়া থাকে। **শঙ্কর বিজয়ের ইহাই প্রকৃত ইতিহাস।**

'শঙ্করের প্রভাব'

ভক্তাবতার শঙ্কর হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত আনুমানিক ১০০০ (সহস্র) বৎসরকাল মায়াবাদের অবস্থা

এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। বুদ্ধের তিক্ত অবৈদিক শূন্যবাদ শঙ্করাবির্ভাবে তাহার বৈদিক শর্করাবরণে আশু মধুর বলিয়া মনে হওয়ায় লোক-সমাজে উহার বেশ আদর ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষভাবে সমূলে উৎসাদন হইলে জনসমাজ নিজদিগকে বৌদ্ধ না বলিয়া 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। আজও পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতগণ 'হিন্দু-ধর্ম্ম' বলিতে শঙ্করের প্রচারিত মতকেই হিন্দুমত মনে করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন। যাহা হউক, শঙ্করাবির্ভাবের ইহাই সুফল বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু 'বাস্তব হিন্দু ধর্ম্ম' বলিতে অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তপর ভগবানের নিত্য সেবাকেই প্রকৃত-বাস্তব হিন্দু-ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মবলা হইয়া থাকে।

এই সহস্র বৎসর মায়াবাদ যে কি প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ভগ্নশিরে, নগ্নদেহে বাস করিতেছিল, তাহারই পরিচয় দিতেছি।

যাদব প্রকাশ

পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি মায়াবাদিগণের পরে, কাঞ্চিনগরের যাদবপ্রকাশই মায়াবাদিগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান আচার্য্য হইয়াছিলেন। যামুনাচার্য্যের এই সময় বৈষ্ণবতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভা দর্শন করিয়া যাদবপ্রকাশ তাঁহার সহিত সন্মুখ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করেন নাই। আচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীযামুন-মুনির শিষ্য। তিনি যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্ত

অধ্যয়নের অভিনয় করিয়া শঙ্করমতের দোষ প্রদর্শন করেন, এবং 'কপ্যাস'-শ্রুতির যাদবীয় মায়াবাদ ব্যাখ্যার খণ্ডন করেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের এই প্রকার প্রতিভা দর্শন করিয়া ঈর্ষানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের সঙ্কল্প করিলেন। যাদবপ্রকাশ তাঁহার জীবন নাশ করার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে জানিয়াও আচার্য্য রামানুজ তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করত তাঁহার চিত্তবৃত্তির সংশোধন করেন। শঙ্কর-জীবনে ইহার অনুরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেও **অভিনব গুপ্তের** প্রতি তিনি কৃপা না করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল রামানুজের চরিত্র এই সম্পর্কে শঙ্করের তুলনায় পরম মাধুর্য্যময়। তিনি তাঁহার প্রাণনাশোদ্যোগী যাদবপ্রকাশকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করায় আচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী ছিলেন তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ভক্তের মহিমা সর্ব্বত্রই এইরূপভাবে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। মায়াবাদ তৎকালে বৈষ্ণব রামানুজ-হস্তে বিনষ্ট হইয়া বিশিষ্টা-দ্বৈত-বাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে থাকে।

শ্রীধরস্বামী

শ্রীধরস্বামী গুর্জ্জরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে অদ্বৈত-বাদিগণ তাঁহার কাল সম্বন্ধে যাহা অনুমান করেন, তাহা প্রকৃত ও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হয় না। **মধ্বমুনি** তাঁহার সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই শাঙ্করগণ তাঁহাকে মধ্বের

পরে বলিয়াই স্থির করিতেছেন। কেবলমাত্র **মধ্ব শ্রীধরের নাম উল্লেখ করেন নাই** বলিয়াই শ্রীধর মধ্বের পরে হইবেন—ইহা ঠিক বিচার নহে। আচার্য্য শ্রীধর-স্বামী বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতির কোন ভাষ্য রচনা না করায় মধ্বমুনি তাঁহার কথা সম্ভবতঃ উল্লেখ করেন নাই; নতুবা তিনি শ্রীধরের কথা নিশ্চই উল্লেখ করিতেন। **শ্রীধর কেবলমাত্র শঙ্করের নাম তাঁহার গীতাভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন**। তাহাতে তিনি শঙ্করের পরবর্ত্তী ও মধ্বের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। রামানুজ প্রধানতঃ বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বন করিয়া বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন। আচার্য্য শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকা করিয়াছেন। রামানুজ উক্ত টীকার সন্ধান পাইলে তাহার উল্লেখ করিতেন এবং তাহা তিনি প্রমাণস্বরূপও গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু **রামানুজ কোথাও শ্রীধরস্বামীর নাম উল্লেখ করেন নাই এবং শ্রীধরস্বামীও আচার্য্য রামানুজের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই**। তাহার দ্বারা শ্রীধরস্বামী আচার্য্য রামানুজের পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূ́ত হইয়াছেন—ইহা সুস্থির করিয়া বলা যায় না। যাহা হউক তিনি রামানুজের পূর্ব্বে বা পরেই হউক, মায়াবাদী অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাকে আজও 'টানাটানি' করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত রাখিতে চান। কারণ শ্রীধরস্বামী পূর্ব্বে কোন অদ্বৈতবাদীর সঙ্গ প্রভাবে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তাঁহার লিখিত টীকা সমূহ হইতেও তাহার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। **পরমানন্দ তীর্থ**

নামক জনৈক নৃসিংহ-উপাসক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তখন শুদ্ধা-দ্বৈতবাদের প্রচারক ছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদের আদি আচার্য্য শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী শঙ্করাবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বে অবস্থিত ছিলেন। তিনি 'আদি বিষ্ণুস্বামী' বলিয়াও জগতে প্রসিদ্ধ আছেন। পরমানন্দ তীর্থের কৃপায় শ্রীধরস্বামী শুদ্ধা-দ্বৈতবাদ আশ্রয় করেন এবং শুষ্কজ্ঞানে প্রকৃত মোক্ষের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র মোক্ষের উপায় ও উপেয়, তাহা বুঝিতে পারেন। তিনি গীতার টীকার শেষে লিখিয়াছেন,—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-বচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মা-দ্ভক্তিরেব মোক্ষ-হেতুরিতি সিদ্ধম্। * * * * পরমানন্দ শ্রীপাদাব্জ-রজঃশ্রী-ধারিনাধুনা শ্রীধরস্বামী-যতিনা কৃতা গীতা সুবোধিনী।"

শ্রীধরস্বামীপাদ মায়াবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে তাহারা কি তাঁহার উক্ত গীতার সিদ্ধান্তে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন? যদি না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর মায়াবাদী শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা কেন?

স্বামীপাদের গীতার টীকা-প্রকাশ সম্বন্ধে একটী বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে তাহার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদা শ্রীধরস্বামী তীর্থ পর্য্যটনের পর কাশীধামে উপস্থিত হইয়া গীতার টীকা রচনা করেন। ঐ টীকোক্ত বিচার দেখিয়া অদ্বৈতবাদী মায়াবাদিগণ নানা প্রকার আপত্তি তুলিয়া তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিবার যত্ন

করেন। পরমবৈষ্ণব শ্রীধরস্বামী কাশীবাসী পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিলেও তাহারা শ্রীধরস্বামীর সুবোধিনী টীকা গোড়ামীবশতঃ মানিয়া লইতে স্বীকার করেন নাই। তৎপর বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু অর্থাৎ কাশীর বিশ্বনাথের নিকট সকলে একত্রিত হইয়া মীমাংসা প্রার্থনা করিলে বিশ্বনাথ পণ্ডিতগণকে এইরূপ স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন,—

"অহং বেত্তি* শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি **শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদতঃ।**"

উক্ত শ্লোকের দ্বারা জানা যায় শ্রীধরস্বামী কাশীবাসী অদ্বৈত-বাদিগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। **এইরূপে পরমানন্দ তীর্থ কর্তৃক শ্রীধরস্বামীর এবং শ্রীধরস্বামী কর্তৃক অন্যান্য মায়া-বাদিগণের পরাভব হইয়াছিল।**

"বিল্বমঙ্গল"

বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বনাম কাহারও কাহারও মতে **শিহ্লন মিশ্র বা চিৎসুখাচার্য্য।** বল্লভ-দিগ্বিজয় গ্রন্থের মতে অষ্টম **শক-শতাব্দী** বিল্বমঙ্গলের উদয় কাল। **ইনি পূর্ব্বজীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন;** কিন্তু পরে মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডিবেষ গ্রহণ করেন। **শঙ্কর সম্প্রদায়ের দারকা মঠের তালিকায় চিৎ-সুখাচার্য্য (কল্যব্দ ২৭১৫) বিল্বমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়।** বল্লভ-দিগ্বিজয়ের মতে বিল্বমঙ্গল দ্বারকাধীশ-প্রতিষ্ঠাতা রাজ-বিষ্ণুস্বামীর প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং ৭ শত (?) বৎসর বৃন্দাবনে

* 'বেত্তি' এস্থলে আর্য-প্রয়োগ। 'বেদ্মি' ইহার শুদ্ধ পাঠ।

ব্রহ্মকুণ্ডে ভজন করিয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার নাম '**লীলাশুক**' হয়। বিল্বমঙ্গল কিভাবে অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবা মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হন, তাহা তিনি স্বরচিত একটী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূ-বিঠেন॥"

অর্থাৎ অদ্বৈত-মার্গের পথিকগণের দ্বারা উপাস্য এবং আত্মানন্দের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াও আমি গোপা-লম্পট কোনও শঠ (কৃষ্ণের) দ্বারা বলপূর্ব্বক তাঁহার দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি। ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণব বিজয়।

ত্রিবিক্রমাচার্য্য

অচ্যুতপ্রেক্ষ তৎকালে মায়াবাদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই সময় শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর, ত্রিবিক্রমাচার্য্য, পদ্মনাভাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মায়াবাদিগণ শঙ্করের অদ্বৈতবাদের তীব্র সাধনা ও বিপুল প্রচার করেন। আনন্দতীর্থ **মধ্বমুনি** দক্ষিণ-কানারা জিলায় উড়ুপী গ্রামের সাত মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহ নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে **বেদবিদ্যার গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।** ইনি বেদান্তের দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া মায়াবাদের সমুদয় যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্যের সহিত উক্ত মায়াবাদি-আচার্য্য-চতুষ্টয়ের সম্মুখ-বিচার হইয়াছিল। রামানুজাচার্য্য যেরূপ যাদব প্রকাশের নিকট শিষ্যত্বের অভিনয়

করিয়াছিলেন, সেইরূপ মধ্বমুনিও **অচ্যুতপ্রেক্ষ** নামক অদ্বৈত-বাদাচার্যকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকারের অভিনয় করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্যের বিচার ও ভজন প্রতিভায় অচ্যুতপ্রেক্ষ পরাস্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যারণ্য মধ্বা-চার্য্যের সহিত সম্মুখ বিচারে পরাস্ত হইলেও তাঁহার স্বমত পরিত্যাগ করেন নাই। পদ্মনাভাচার্য্য ও ত্রিবিক্রমাচার্য্যের সহিত সম্মুখ বিচারে মধ্বাচার্য্য তাহাদিগকে অদ্বৈত-বাদ হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-মতে আনয়ন করিয়াছিলেন। ত্রিবিক্রমা-চার্য্য অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মহাপণ্ডিত আচার্য্য ছিলেন। তাঁহারই পুত্র নারায়ণাচার্য্য **'মধ্ববিজয়'** ও **'মণিমঞ্জরি'** গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রিবিক্রমাচার্য্য পরে মধ্ব-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি উভয়-দর্শন সম্বন্ধেই বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার নিকটেই শ্রবণ করিয়া নারায়ণাচার্য্য শঙ্কর সম্বন্ধে ও মধ্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জগৎকে জানাইয়াছেন। সুতরাং **শঙ্কর ও মধ্ব উভয় সম্প্রদায়েই শ্রীনারায়ণাচার্য্যের গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া** গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। 'মণি-মঞ্জরী' গ্রন্থ "মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত কোন আচার্য্যের লেখনী-নিঃসৃত বলিয়া সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট"—এ'প্রকার উক্তি সমিচীন নহে। এই সময়ে দেখা যাইতেছে—মধ্বাচার্য্য তাঁহার বিচার-যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের প্রবল প্রতাপের দ্বারা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্যদ্বয়কে বিচারে পরাস্ত করেন এবং

তাঁহারা সরলতা ও নিরপেক্ষতা প্রযুক্ত পূর্ব্বকার মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া মধ্বমত অঙ্গীকার করেন। অপর দুইজন বিচারে পরাস্ত হইলেও নিরপেক্ষতার অভাবে ও সংস্কার বশতঃ মায়াবাদের অশুদ্ধতা পরিজ্ঞাত হইয়াও তাহার ক্ষীণধারা হৃদয়ে বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তৎকালে মায়াবাদ মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ববাদী মধ্বের নিকট মস্তক মুণ্ডিত করিয়াছে।

'দ্বিতীয় শঙ্কর—বিদ্যারণ্য'

বিদ্যারণ্যের অপর নাম **'মাধব'**। তাঁহার পিতার নাম **'সায়ন'**। এই জন্য কেহ কেহ বিদ্যারণ্যকে **'সায়ন-মাধব'**ও বলিয়া থাকেন। বিদ্যারণ্য পাণ্ডিত্য প্রতিভায় এইরূপ উচ্চাসন অধিকার করিয়াছিলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের পরে বিদ্যারণ্যের ন্যায় পণ্ডিত অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে আর কেহই আবির্ভূত হন নাই—বলিয়া প্রকাশ। এবং তিনি **শঙ্করের অবতার ও দ্বিতীয়-শঙ্কর** বলিয়া মায়াবাদি-সমাজে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময় মাধ্ব-সম্প্রদায়ে **অক্ষোভ্যমুনির** আবির্ভাব হয়। ইনি ন্যায় শাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি উক্ত দ্বিতীয়-শঙ্করকে সম্মুখ বিচারে আহ্বান করেন। এবং বিচারকালে রামানুজ-সম্প্রদায়ের মহাপণ্ডিত মহামতি **শ্রীশ্রীবেদান্তদেকিশাচার্য্যকে** উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে **মধ্যস্থ** নিরূপণ করিয়া উভয়ই উভয়ের সহিত বিচার-সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। এস্থলে বলা বাহুল্য যে—মধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত রামানুজ সম্প্রদায়ের 'স্বয়ং ভগবানের অবতারত্ব' ও 'ভজনের

বৈশিষ্ট্যাদি' লইয়া বিশেষ বিবাদ চলিতেছিল। এমন কি উভয় সম্প্রদায় মধ্যে কন্যা-পুত্রের বিবাহ স্থলে আদান-প্রদান, শ্রাদ্ধাদিতে ভোজন প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইয়াছিল। বিদ্যারণ্যের ন্যায়-শাস্ত্রে অধিক পাণ্ডিত্য না থাকায়, অক্ষোভ্য তীর্থের সহিত তাঁহার পরাজয় হইল। অক্ষোভ্য মুনির ন্যায়-সঙ্গত বিচার-অসিতে বিদ্যারণ্যের মায়াবাদারণ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অক্ষোভ্য-বিজয় সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিত সমাজে নিম্নলিখিত শ্লোকটী সুপ্রসিদ্ধ আছে—

"অসিনা তত্ত্বমসিনা পর-জীব প্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমরণ্যানি হ্যক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ॥"

ইহার পর হইতে বিদ্যারণ্যের প্রতাপ কমিয়া গেল। অক্ষোভ্য মুনি ও বিদ্যারণ্যের আবির্ভাব ন্যূনাধিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে।

জয়তীর্থ

তৎপর বৈষ্ণব-সমাজে জয়তীর্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। জয়তীর্থ অক্ষোভ্যমুনিরই শিষ্য। অক্ষোভ্যমুনির কৃপায় জয়তীর্থ একজন দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা' নাম্নী বেদান্তের শ্রীমাধ্বভাষ্য-টীকা ও 'ন্যায়সুধা' নামক গ্রন্থ বিচার-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—"সুধা বা পঠনীয়া" বসুধা বা পালনীয়া।" তখন গুরুশিষ্য উভয়েরই প্রচণ্ড প্রচারফলে অদ্বৈতবাদ গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত হইল।

গৌড়পূর্ণানন্দ নামক মধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য "তত্ত্ব-মুক্তাবলী" বা মায়াবাদ-শতদূষণীতে মায়াবাদের একশত প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের ব্যাস-তীর্থ "ন্যায়ামৃতম্" "ভেদোজ্জীবনম্" প্রভৃতি গ্রন্থে এবং মধ্বাচার্য্যের প্রায় তিনশত বৎসর পরে আবির্ভূত **বাদিরাজতীর্থ (দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য)** "যুক্তিমল্লিকা", "পাষণ্ডমতখণ্ডনম্", "সুধা-টিপ্পনী" প্রভৃতি গ্রন্থে মায়াবাদকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠাশালী মায়াবাদী মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভাগবতসিদ্ধান্তের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। কিন্তু **কি আশ্চর্য্য, আজ পর্য্যন্ত কোন বৈষ্ণবই অদ্বৈতবাদীর নিকট মস্তক অবনত করেন নাই।**

প্রকাশানন্দ সরস্বতী

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে অদ্যাবধি প্রায় ৪৮১ বৎসর। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া দিব্যালোকে আলোকিত হইয়াছিল। চেতনালোকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বহু অদ্বৈতবাদী-পতঙ্গ আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে। এই সময় তিনি বারাণসীক্ষেত্রে মায়াবাদ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য গৌরবে 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী'

দ্বারা অদ্বৈতবাদীর নূতন জীবনীশক্তি লাভ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বহুদূর হইতেই অর্থাৎ (শ্রীধাম মায়াপুর হইতেই) তাঁহার নাম ও বিচার শ্রবণ করিয়া স্নেহবশে বলিয়াছিলেন—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৩৭)

শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ অবতারী ভগবান্। প্রকাশানন্দ অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্ত অনুসারে—ভগবান্ নিরাকার, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি বিচার তাঁহার শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলে ভগবানের অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করা হয়—বলিয়া তিনি উক্তি করিয়াছেন। প্রতি যুগেই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া অদ্বৈতবাদিগণের কাহাকে কাহাকে বিনাশ ও কাহাকে কাহাকে বৈষ্ণবমতে আনয়ন করিয়াছেন। চৈতন্যদেব এযুগে পরম কৃপা করিয়া কাহারও বিনাশ না করিয়া নিজ বিশুদ্ধ মতে আনয়ন বা নিজসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন।—এবার "প্রাণে না মারিল কারে"। তাই শ্রীচৈতন্যদেব প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদকে উদ্ধারকল্পে সদলবলে কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের বহু দোষ উদ্ঘাটন করিয়া অনেক বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই বিচারকালে সরস্বতীপাদের বহু শিষ্য, ছাত্র প্রভৃতি অসংখ্য অদ্বৈতবাদী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় উভয়ের বিচার মনোযোগ-সহকারে অনুধাবন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর বিচারের সারবত্তা ও যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া সরস্বতী-

পাদ তাঁহার নিকটে বিচারে পরাস্ত হন এবং তাঁহার নিকট মস্তক বিক্রয় করেন।

"সেই হইতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪৯)

প্রকাশানন্দ তাঁর আসি' ধরিলা চরণ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৬৯)

চৈতন্যদেবের কৃপায় ও প্রচারের ফলে শুধু **প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদই তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন এমন নহে, সমস্ত বারাণসীবাসী মায়াবাদী সকলেই নিস্তারলাভ করিয়াছিলেন।** এবং বারাণসী ক্ষেত্র শঙ্করক্ষেত্র না হইয়া নিমাইক্ষেত্র নদীয়া-নগরে পরিণত হইয়াছিল। তাই কবিরাজ গোস্বামী অনুমান ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—

"সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার॥
নিজ লোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হইল দ্বিতীয় নদীয়া-নগর॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৫৯-৬০)

এইরূপে চৈতন্যদেব মায়াবাদী বা অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদকে বেদান্তের অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তে স্থাপন করিয়া কাশীতে মায়াবাদরূপ দুষ্কৃতির বিনাশ সাধন করিলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম

কাশীতে যে প্রকার সন্ন্যাসিসমাজে উক্ত সরস্বতীপাদ সমাজ-পতি ছিলেন, তেমনি শ্রীক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের একাধিপত্য ছিল। তিনি ষড়্‌দর্শনের এবং

সর্ব্বশাস্ত্রের বিশেষতঃ মায়াবাদের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তিনি 'সার্ব্বভৌম' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে থাকাকালীন তাঁহার নিকট বেদান্ত শ্রবণের ছল করিয়া তাঁহার উদ্ধার মানসে তথায় গিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম বেদান্তের অদ্বৈত বা শাঙ্কর-ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; মহাপ্রভু তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করেন। তদ্দর্শনে সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহার মন্তব্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গকে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের বিচারের নানা প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করেন। সার্ব্বভৌম নিজমতের অসারতা বুঝিতে পারিলেন এবং চৈতন্য-দেবের শরণাপন্ন হইলেন।—

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥

দেখি সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি'।
পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি'॥

প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২০১, ২০৪, ২০৫)

চৈতন্যদেবের প্রচারের বৈশিষ্ট্যে মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় এবং শঙ্করের গোবর্দ্ধন মঠ ভূগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া সমাধি লাভ করে।

সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সেবকগণও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার সেবার্থে মায়াবাদ বিনাসের সহায়ক হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণও চৈতন্যদেবকে সাক্ষাদ্ ভগবান্ জানিয়া তাঁহার প্রদর্শিত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহার লীলার সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে **সনক সম্প্রদায়ের আচার্য্য 'কেশব-কাশ্মিরী', বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বা শ্রীধর-স্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য 'বল্লভের' নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।** ইঁহারা দুইজনই চৈতন্যদেবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী **কেশব কাশ্মিরীর** কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই। তিনি দিগ্বিজয় করিতে গিয়া চৈতন্যদেবের নিকট পরাস্ত হইয়া ভাগবতধর্ম্মের শিক্ষালাভ করেন। পরিশেষে তিনি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের **বেদান্ত কৌস্তুভাদি** গ্রন্থ রচনা করিয়া তৎসম্প্রদায়ের প্রভুত পুষ্টি সাধন করেন। **বর্ত্তমান সময়ে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি চৈতন্যদেবের প্রচারের ফল-স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।**

উপেন্দ্র সরস্বতী

কাশীনিবাসী উপেন্দ্র সরস্বতী অদ্বৈতবাদের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। আচার্য্য বল্লভ ইহাকে বিচারে পরাস্ত করার দরুণ, তাহার চিত্তে হিংসার উদয় হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে জীবন সংশয় জানিয়া বল্লভ কাশী পরিত্যাগ করেন। ইহা ছাড়া তিনি বিজয় নগরেও একটী মহা অদ্বৈতবাদীকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে বল্লভাচার্য্য মায়াবাদের বিনাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যসেবার সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও ব্যাসরায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত মধ্ব-সম্প্রদায়ের তদানীন্তন-কার প্রধান প্রধান আচার্য্যবর্গের সহিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার ও আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। রঘুবর্য্য তখন উড়ুপী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ব্যাসরায় রঘুবর্য্যের পরে ক্রমশঃ অধ্যক্ষতা লাভ করেন। তিনি অতি দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন। ন্যায় শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া পণ্ডিত সমাজ আজও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কাহারও মতে তিনি ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে জীবিত ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এবং জীবনের শেষ ৬০ বৎসর তিনি উড়ুপী মঠের অধ্যক্ষতা করেন। তাঁহার অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈত থাকিলেও শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহা অনুমান করিতে কোনও বাধা নাই। কারণ, চৈতন্যদেব অনুমান ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে উড়ুপী ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। সেই সময় আচার্য্য 'ব্যাসরায' তথাকার মাধ্ব মঠের অধ্যক্ষপদে সমাসীন ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ হইলেও আধ্যক্ষিক পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে ন্যায়-শাস্ত্রের অধিদেবতা বলিয়া জানিতেন। তাঁহার ন্যায়-শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রতিভার কথা শ্রবণ করিয়া রঘুবর্য্যতীর্থ, ব্যাসরায় প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছিলেন। ব্যাসরায়ের ন্যায়-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য

ছিল। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি আরও ন্যায়-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাসরায়ের রচিত **"ন্যায়ামৃত"** গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের ফল-স্বরূপ বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুগত জনগণের প্রচণ্ড প্রচার-প্রতাপে যে মায়াবাদের সার্ব্বভৌম বিচার দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ব্যাসরায়ের ন্যায়া-মৃতে'র প্রবল সুতীক্ষ্ণ ধারায় বিধৌত হইয়া অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইতে বসিয়াছিল। এমন **সময়** অদ্বৈতবাদিকুল অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া প্রাণ রক্ষার জন্য **'বিপদে মধুসূদন'** বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

মধুসূদন সরস্বতী

মায়াবাদের আর্ত্তনাদ নিবারণের জন্য ভস্মীভূত মায়াবাদের ভস্ম লইয়া পণ্ডিতকুলচূড়ামণি 'মধুসূদন' 'অদ্বৈতসিদ্ধি'রূপ সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। মধুসূদন পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার উনসিয়া নামক একটী পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে শ্রীরাজ-তীর্থের নিকট বেদান্তের মায়াবাদপর ভাষ্যসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং আচার্য্য **'ব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃত'** গ্রন্থের **খণ্ডন চেষ্টায়** "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক এক সমৃদ্ধিশালী বিরাট্ গ্রন্থ রচনা করেন। এই **অদ্বৈতসিদ্ধি রচনার পর মধুসূদন মনে মনে ইহার খণ্ডন সম্ভবনা জানিয়া অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিত-গণের নিকট ইহা কখনও অধ্যয়নের জন্য দিতেন না।**

সর্ব্বদাই অতি গোপনে রাখিতেন। ব্যাসরায়ের শিষ্য ব্যাসরাম তাঁহার দুরভিসন্ধি জানিয়া ছদ্মবেশে অদ্বৈতসিদ্ধি অধ্যয়নের ছল করিয়া উহা কণ্ঠস্থ করেন; এবং ন্যায়ামৃতের "তরঙ্গিনী" নাম্নী টীকা রচনা করিয়া মধুসূদন নির্ম্মিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'রূপ মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। তৎকালে অচিন্ত্যভেদাভেদাচার্য্য পণ্ডিতকুলমুকুটমণি শ্রীল জীব গোস্বামীপ্রভু প্রকট ছিলেন। মধুসূদনের সহিত শ্রীকাশীধামে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন তিনি বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য মধুসূদনের নিকট বৃন্দাবন হইতে কাশীতে আসিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, মধুসূদনের সহিত শ্রীল জীবপাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতভেদ লক্ষ্য করা যায় না। কাশীতে অবস্থান কালে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার হয়। সেই বিচারের ফলে মধুসূদনের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে। এবং শ্রীজীবগোস্বামীর কৃপায় তিনি অদ্বৈতজ্ঞান অপেক্ষা ভাগবত-ধর্ম্মের অর্থাৎ ভক্তি-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করেন এবং তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তিস্বরূপ "ভক্তি-রসায়ন" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে তিনি ভক্তিকেই একমাত্র পরম পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

নবরসমিলিতং বা কেবলং বা পুমর্থম্
পরমিহ মুকুন্দে ভক্তিযোগং 'বদন্তি'।
নিরুপমসুখ-সম্বিদ্রূপমস্পৃষ্টদুঃখম্
তমহমখিল-তুষ্ট্যৈ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ব্যনজ্মি॥

অর্থাৎ "শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া জীবের চরম কল্যাণরূপ অখিলতুষ্টির নিমিত্ত দুঃখসম্পর্কশূন্য অতুলনীয় সুখ ও সম্বিৎ-শক্তি স্বরূপা **মুকুন্দে ভক্তিযোগ,** যে ভক্তিযোগকে (শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ন্যায়) গুরুবর্গ নবরসমিলিত এবং একমাত্র (কেবলম্) পরম পুরুষার্থ বলিয়া ইহ জগৎকে জানাইয়াছেন, তাহাই বর্ণন করিতেছি।"

উক্ত শ্লোকের 'বদন্তি' এই বহুবচনান্ত শব্দের দ্বারা শ্রীজীব-গোস্বামিপাদকেই তাঁহার গুরুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি **গৌরবে বহুবচন** ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে মধুসূদন মায়াবাদের কেবল-জ্ঞানের পরমপুরুষার্থতার বিচার ত্যাগ করিয়া **কেবলা ভক্তিকেই** পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানাইয়াছেন।

জয়পুরে মায়াবাদ

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে অদ্বৈতবাদের নির্ব্বাণের পরে মধু-সূদনের নির্ম্মিত সমাধিমন্দির শ্রীজীবপাদ ও ব্যাসরাম কর্ত্তৃক ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে প্রেতাত্মার ন্যায় কতিপয় প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী জমায়েৎ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-বিরোধী সম্প্রদায় জয়পুরের রাজগৃহে উৎপাত করিতেছিল। সেই উৎপাত নিবারণার্থ বৃন্দাবন হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীবিশ্ব-নাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের প্রতিনিধি-স্বরূপ গৌড়ীয় বেদান্তচার্য্য **শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ** প্রভু আহূত হইয়াছিলেন। জয়সিংহ তখন তথাকার অধিপতি ছিলেন। গোবিন্দ নাম ব্যতীত

প্রেতাত্মার ও রাধা-বিরহিত ঐশ্বর্য্যপর তত্ত্বের সেবকগণের কল্যাণ নাই জানিয়া শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তে **গোবিন্দ-ভাষ্য রচনা** করিয়া মায়াবাদের ও ঐশ্বর্য্যবাদের কুদৃষ্টি হইতে রাজপুরীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে বলদেবের কৃপায় জয়পুর মায়াবাদ ও ঐশ্বর্য্য-সেবাবাদ হইতে মুক্ত হইয়া রাজপ্রাসাদে মাধুর্য্যময় ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষিত হইল।

মায়াবাদের প্রেতাত্মা

চৈতন্যদেব ও তদ্‌ভৃত্যগণের আবির্ভাবের পর অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রকৃত মায়াবাদী স্থূলতঃ পরিদৃষ্ট হইত না। মাঝে মাঝে যাহাদিগকে মায়াবাদাশ্রিত বলিয়া মনে হইত তাহাদিগকে অশরীরী বায়ুভূত নিরাশ্রয় স্বরূপ মায়াবাদের প্রেতাত্মা বা তাহার তর্পণকারী বলিয়াই মনে হইত। উক্ত প্রেতাত্মাগণের উদ্ধারের জন্যও বৈষ্ণব ওঝাগণ সময় সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। রামানুজ-সম্প্রদায়ের **রামশাস্ত্রী** শৃঙ্গেরী মঠের স্বামী সচ্চিদানন্দকে বিচারে পরাস্ত করেন। প্রতিবাদী-ভয়ঙ্কর **অনন্তাচার্য্য** উক্ত সম্প্রদায়েরই আর একজন পণ্ডিত। তিনি দিগ্বিজয়ের জন্য বহির্গত হইয়া বারাণসী-ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদী রাজেশ্বর শাস্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী-দ্বয়কে বিচারে পরাস্ত করেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের **সত্যধ্যান তীর্থও** কাশীতে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া **'অদ্বৈতমতবিমর্ষ'** ও **'ত্রিপুণ্ড্রধিক্কার'** নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

পঞ্চভঙ্গী ন্যায়

ব্যাসতীর্থের 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থের প্রতিপক্ষে মধুসূদন সরস্বতীর 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র খণ্ডনে মধ্ব-সম্প্রদায়ের ব্যাস-রামতীর্থ রচিত "তরঙ্গিনী", তরঙ্গিনীর প্রতিপক্ষে মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মানন্দ লিখিত "ব্রহ্মানন্দীয়" এবং তাহার খণ্ডনরূপে মধ্ব-সম্প্রদায়ের "বনমালামিশ্রিয়" গ্রন্থপঞ্চক 'পঞ্চভঙ্গী' নামে প্রসিদ্ধি আছে। শুনা যায় মহীশূর রাজগ্রন্থাগারে এখনও উহা সংরক্ষিত আছে। এই পঞ্চভঙ্গী মায়াবাদ ও তাহার যাবতীয় যুক্তিতর্কের খণ্ডন প্রমাণিত করিয়াছে।

বৈষ্ণবাচার্য্য ব্যতীত অন্যান্য মনীষিগণ কর্ত্তৃক মায়াবাদ খণ্ডন

মায়াবাদের অসৎ সিদ্ধান্তের প্রতি বৈষ্ণবগণ ব্যতীত **নৈয়ায়িক, মীমাংসক, শৈব, সাংখ্য** মতের আচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণও কটাক্ষ করিয়া বিশেষ নিন্দাবাদ, দোষ প্রদর্শন ও খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গেশ উপাধ্যায়, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, নারায়ণ ভট্ট (যিনি অদ্বৈতবাদী নৃসিংহ আশ্রমের শিষ্য নারায়ণ আশ্রমকে সম্মুখ বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন), ভাস্করাচার্য্য, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি মহাত্মগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগের অবস্থা

আধুনিক যুগে মায়াবাদ বহুরূপী প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে জগতে বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে। যান্ত্রিক যুগে যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত যোগসূত্র

স্থাপন হওয়ায় ভারতীয় মায়াবাদ বিভিন্ন দেশের মায়ার রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন প্রকারের অভিনয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া মায়াবাদের বিচিত্র রূপ গড়িয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিলেও এবং কাহারও কাহারও মতে মায়াবাদের আপাতবিরুদ্ধযুক্তি থাকিলেও উঁহারা বিভিন্ন-ভাবে মায়াবাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতমত ভারত হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হয়। আলেকজাণ্ডারের সহিত কয়েকজন পণ্ডিত ভারতে আসিয়া এই কেবলাদ্বৈতবাদ শিক্ষা লাভ করিয়া যান। এবং কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

'পঞ্চোপাসনা' ও 'সমন্বয়বাদ' মায়াবাদের দুইটী আধুনিক অবৈধ সন্তান। রাজনীতি কুশল আকবর তাঁহার রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সমন্বয়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই তাঁহার "দীন-ই-লাহি" ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক যুগে সামাজিক ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিকগণ সুবিধাবাদ সংগ্রহের জন্য মায়াবাদ-কুলগৌরব সমন্বয়বাদের আদর করিতেছেন। আবার বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম করিয়াও মায়াবাদের নানারূপ তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়াছে। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী, প্রভৃতি মতবাদিগণ বহুরূপী প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী। উড়িষ্যার অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস, আসামের শঙ্করদেব সকলেই

ন্যূনাধিক বিগ্রহ-বিরোধী ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী। শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভাবের পর উদিত রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু প্রভৃতি সমন্বয় পন্থিগণ সকলেই ন্যূনাধিক মায়াবাদী। এই মায়াবাদ যে আধুনিক জগতে কত বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে **ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ** ও তৎপরে গৌড়ীয় মঠাচার্য্য জগদ্‌গুরু **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** নির্ভীককণ্ঠে ও সিংহ-হুঙ্কারে বিশ্লেষণ ও প্রচার করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যাক্তিগণের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ প্রচার করিয়া এই মায়াবাদাদি কুমত ও কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন—এরূপ নহে; পরন্তু সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বেদান্ত-গ্রন্থাদি প্রকাশ, প্রচার ও আলোচনার সুযোগ প্রদান করিয়া বহুরূপী মতান্ধকারকে শ্রীচৈতন্য-সিদ্ধান্তবাণী ও ভাগবতার্ক-মরীচিমালায় প্রখরতম তেজে ভস্মীভূত করিয়াছেন। এমনকি সুদূর পাশ্চাত্য জগতে যেখানে ভোগ-বাসনা, কামনার উচ্ছৃঙ্খল-নৃত্য অবিরতভাবে চলিতেছে সেই দেশও অর্থাৎ **লণ্ডন ও আমেরিকা** প্রভৃতিতেও তাঁহার নিজজনগণকে প্রেরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী স্বার্থক করিয়াছেন। মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

> "পৃথিবীতে আছে যত নগর আদি গ্রাম।
> সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এই বাণীর স্বার্থকতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের জীবনেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

উপসংহার—

[ক] ঐতিহ্য

উপসংহারে অধিক কথা লিখিয়া আমি পাঠকবর্গকে ব্যস্ত করিতে চাহি না। আমি প্রতি খণ্ড-বিষয়ের শেষ অংশে অল্প-বিস্তর মন্তব্যসমূহ জ্ঞাপন করিয়াছি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে জানিতে পারিবেন—**কোন বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষই মায়াবাদীর সহিত সম্মুখ বিচারে পরাস্ত হইয়া, শুদ্ধভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিয়া মায়াবাদের শুষ্ক জ্ঞান-পথ গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে মায়াবাদিগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সহিত সম্মুখ বিচারে পরাস্ত হইয়া তাহাদের স্বমত ত্যাগ করতঃ বিষ্ণুর পরতমত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।**

আচার্য্য শঙ্করের দিগ্বিজয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন—তিনি যাহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাদর মধ্যে মণ্ডন-মিশ্রই সর্ব্ব প্রধান। মণ্ডনমিশ্র জৈমিনী মতের কর্ম্মী ও স্মার্ত্ত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ও শঙ্করকর্ত্তৃক পরাজিত অন্যান্য (?) মহাজনগণ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেরই "শঙ্কর বিজয়" প্রসঙ্গে (৮৬—৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। তৎপরে অদ্যাবধি কেবলমাত্র আচার্য্য 'নৃসিংহ আশ্রমের' জীবনী হইতে জানা যায়, তিনি **'শৈব পণ্ডিত' অপ্যয়**

দীক্ষিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের জ্ঞানবাদে আনয়ন করিয়াছিলেন। আচার্য্য অপ্যয় দীক্ষিতের গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায়, তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতে পঞ্চোপাসনা জাগরূক ছিল। আচার্য্য শঙ্কর অজ্ঞ জীবের জন্য পঞ্চোপাসনার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাস্করের বিচার-পদ্ধতি অনুসারে ইহাঁকে প্রকৃত শৈব বলিয়াও মনে হয় না। যাহা হউক, তিনি যে বৈষ্ণব ছিলেন না এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। অবৈষ্ণব অপ্যয় দীক্ষিত অবৈষ্ণবের অন্য কোনও জ্ঞানবাদ-মত গ্রহণ করিলে তাহাতে বৈষ্ণবগণের কোনও হানি নাই এবং জ্ঞানবাদেরও তাহাতে প্রাধান্য স্থাপিত হয় না।

সত্যযুগের চতুঃসন হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করাবির্ভাব পর্য্যন্ত পঞ্চসহস্র ৫০০০ বৎসরের অদ্বৈতবাদ বা সোঽহং-বাদের বা মায়াবাদের ইতিহাস হইতে মায়াবাদিগণের জন্মবৃতান্ত বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—মন্ত্রে আমাদের উৎপত্তি স্থান নিরুপিত হয়। অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে প্রধান প্রধান পুরুষগণের উৎপত্তির অস্বাভাবিকতা হইতেই বোধ হয় তাঁহারা 'শক্তি ও শক্তিমানের' বিচার ত্যাগ করিয়াছেন এবং পিতৃমাতৃত্বের সমূলে উৎপাটন করিয়া অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার ও তাঁহার মায়াশক্তির অস্বীকার করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের সংস্থাপক হইয়াছেন।

মায়াবাদের যুক্তিসমূহ কি ভাবে বৈষ্ণবগণের যুক্তি দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন থাকিলেও এই

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশ করার সুবিধা না থাকায়, তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। এতৎ সম্পর্কে আমরা শ্রীল জীবপাদের 'ষট্সন্দর্ভ', 'ক্রমসন্দর্ভ', 'সর্ব্বসম্বাদিনী' ও শ্রীল বলদেব প্রভুর "গোবিন্দ-ভাষ্য", "সিদ্ধান্ত রত্ন", "প্রমেয় রত্নাবলী", "বিষ্ণু-সহস্রনাম-ভাষ্য", "উপনিষদ্-ভাষ্য"সমূহ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলের একমাত্র নিয়ামক, যতিরাজ-কুলসম্রাট-মুকুটমণি পরমহংসস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি-সম্বলিত "গৌড়ীয় ভাষ্য" প্রভৃতি আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

[খ] নির্ব্বাণরূপ ফল-নিরোধ

মায়াবাদের জীবনী আলোচনা-মুখে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মায়াবাদের আদ্যোপান্ত ইতিহাস ও তত্ত্বসমুদয় ঐতিহাসিক ভাবেই অর্থাৎ 'ঐতিহ্য'-প্রমাণের দ্বারাই অযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদ অত্যন্ত দুর্ব্বল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মুখ বিচারে চিরদিনই—অর্থাৎ **চতুঃসনাদি সত্যযুগ হইতে শঙ্করাদি অদ্য পর্য্যন্ত পরাভব স্বীকার করিয়া আসিতেছে।** তথাপি প্রাচীন কালেও এই মতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া কেহ যদি ইহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সেস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে—**মায়াবাদ কথিত নির্ব্বাণ-মুক্তি মিথ্যা এবং কল্পনা-প্রসূত স্তোপবাক্য মাত্র।** ইহা কেবল ঐতিহ্য প্রমাণের দ্বারাই নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ

করিয়া দিতে পারা যায়। **বস্তুতঃ নির্ব্বাণ বলিয়া কোন অবস্থাই জীব লাভ করিতে পারে না এবং তাহা কাহারও লভ্যও হয় নাই।** অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেহই ঐরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত একটীও নাই। কারণ **গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ, শঙ্কর ও মাধবের জীবনী** আলোচনা করিলে, আমরা উক্ত সত্যে উপনীত হইতে পারি এবং উঁহারা কেহই যে উঁহাদের কথিত নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন নাই বা করিতে পারিবেন না, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। আচার্য্য শঙ্করের জীবনীতে প্রকাশ যে, তিনি একদিন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা কালে তাঁহার পরম গুরুদেব শ্রীগৌড়পাদ আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"শঙ্কর! তোমার গুরুদেব আচার্য্য গোবিন্দপাদের নিকট তোমার প্রভূত প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়াছি এবং তুমি আমার 'মাণ্ডুক্য কারিকা'র যে ভাষ্য রচনা করিয়াছ তাহা দেখাও।" আচার্য্য শঙ্কর তাহা প্রদর্শন করাইলে গৌড়পাদ তাহা হৃষ্টচিত্তে অনুমোদন করিয়াছিলেন।

শঙ্কর-জীবনের উক্ত ঘটনা হইতে জানা যায়, গৌরপাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই বিদেহমুক্তির পরে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হইয়া থাকিলে, গৌরপাদ শঙ্করের সম্বন্ধে কোনও কথা গোবিন্দপাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রুত বিষয় পুনরায় গৌরপাদ শঙ্করকে আসিয়া জ্ঞাপন করা কখনই সত্য বা সম্ভবপর হইতে পারে না।

শঙ্করও তাঁহাকে 'মাণ্ডুক্য কারিকা'র ভাষ্য দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনুমোদন পাইয়াছেন ইহাও অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে গৌড় ও গোবিন্দের নির্ব্বাণ-মুক্তি **হয় নাই—ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে বাধ্য।**

নির্ব্বাণ মুক্তির যাহা লক্ষণ তাহাতে কি উক্ত ঘটনা সম্ভবপর হয়? আমার মতে ঘটনা কতক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা। তাঁহাদের কা কথা, স্বয়ং **শঙ্কর পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া** মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। **ইহাই কি নির্ব্বাণ মুক্তির পরিণতি?** উক্ত আচার্য্যবর্গের নির্ব্বাণ-মুক্তির অদ্যাবধি **এরূপ কোন সিদ্ধান্তই পাওয়া যায় না, যাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, নির্ব্বাণের পরেও পরস্পর কথপোকথন ও পুনরাবির্ভাব সম্ভব হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, 'নির্ব্বাণ-মুক্তি' একটী মিথ্যা স্তোপবাক্য মাত্র বা লোক সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র;** যেহেতু 'নির্ব্বাণ-মুক্তির' প্রধান প্রচারকগণ এমন কি, যাঁহারা ঐ মতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও চলে, তাঁহারাও ঐ মুক্তি পান নাই—অন্যের কা কথা।

আরও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শঙ্কর স্বপ্নতত্ত্বকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া 'জগন্মিথ্যাত্ববাদ' স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনী প্রকাশক **মায়াবাদিগণ স্বপ্নকে সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।** তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা বলিতে চাহি,

শঙ্করের মাতা কুল-কলঙ্কিনী হওয়ায়, লোক লাঞ্ছনাভয়ে আত্ম-হত্যা করিতে গেলে **মঘমণ্ডনের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে—এই 'বিশিষ্টার' গর্ভে 'শঙ্কর' অবস্থান করিতেছেন।** সুতরাং তিনি যেন আত্মহত্যা করিয়া জীবন নাশ না করেন। কিছুদিন **পরে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল। শঙ্কর আবির্ভূত হইলেন।** ইহাতে কি স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল? বিশিষ্টার গর্ভে 'শঙ্কর বলিয়া কি কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই? এসমস্ত কথাই কি 'স্বপ্নোপম' 'মায়োপম' 'মিথ্যা' বলিয়া জানিতে হইবে? এই সকল ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বিদ্যমান থাকিতে মায়াবাদের 'স্বপ্ন'-দৃষ্টান্ত অনুসারে জগৎকে কি মিথ্যা বলা চলে?

[গ] ব্রহ্মসূত্র (মায়ামাত্রন্তু ৩।২।৩) আলোচনা

এস্থলে আমি পাঠকবর্গের এই গ্রন্থালোচনার প্রথম পৃষ্ঠায় জীবনী 'আলোচনার' ধারা প্রসঙ্গের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'বৈষ্ণব-বিজয়' হইলেও 'মায়া-বাদের জীবনী'র ইতিবৃত্ত বিষদ্ভাবে বর্ণনামুখে বেদান্ত দর্শনের **"মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ"**— (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩ সূত্র) আদর্শ স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছি। কারণ শঙ্করা-চার্য্যের মতবাদ ব্রহ্মবাদ নহে, তাহা মায়াবাদ ইহা প্রদর্শন করাই আমার এই প্রবন্ধের শাস্ত্রানুমোদিত উদ্দেশ্য। পাঠকবর্গ ধীরভাবে এই প্রবন্ধের আদ্যপান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন প্রকৃত শাস্ত্রীয় 'ব্রহ্ম'—'শূন্য' নহে এবং মায়াধীশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার

চিৎ-অচিৎ শক্তিসমূহের ঈশ্বরস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ। কারণ শাস্ত্রকারগণের বর্ণনাভঙ্গী হইতে জানা যায়, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া পরতত্ত্ব সম্বন্ধে—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(ভাঃ ১।২।১১)

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে উক্ত ত্রিবিধ-তত্ত্বের সশক্তিক সবিশেষ তত্ত্বসমূহের দশাবতারাদির বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের আবির্ভাব সমূহের মধ্যে রাম, নৃসিংহ, বরাহ, প্রভৃতি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সমূহের বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরেই—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

(ভাঃ ১।৩।২৮)

এতদ্ব্যতিত শাস্ত্রের বহুস্থানে উক্ত ত্রিবিধ পরতত্ত্ব মধ্যে 'ব্রহ্মের' অতিরিক্ত 'পরব্রহ্ম' বা 'পরমব্রহ্ম' বহুস্থানে উল্লেখিত হইয়াছে; এমন কি আচার্য্য শঙ্কর কথিত 'আত্মা' শব্দেরও পরিবর্ত্তে পরমাত্মা শব্দের বহু উল্লেখ আছে। ইহা হইতে ব্রহ্ম বা আত্মা 'পরম' নহে। **পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মাই 'পরম' বলিয়া প্রমাণিত হয়—ব্রহ্ম পরম নহে।** আশ্চার্য্যের বিষয়, ভগবদ্ শব্দের পূর্ব্বে পরম শব্দ ব্যবহৃত হইয়া কোথাও 'পরম ভগবান্' উল্লেখিত হয় নাই। ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয়, **ভগবৎতত্ত্বই পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম পরতত্ত্ব নহে।** এবং বেদান্ত দর্শনে বেদব্যাস জিজ্ঞাসাধিকরণে ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা

করিতে গিয়া তাহার উত্তরে "অথাতঃ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকেই বুঝাইয়াছেন। পরন্তু শঙ্কর কথিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহে।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন,—ব্রহ্ম নিঃশক্তিক, সুতরাং তাহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির শক্তি কোথায়? তিনি আরও বলেন, ব্রহ্ম মায়াগ্রস্থ হইয়া জীব পর্য্যায় আসিলেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির কর্ত্তা হইয়া থাকেন। মায়াগ্রস্থ ব্রহ্মই সমস্ত করিয়া থাকেন। তিনি তখন আর ব্রহ্ম থাকেন না—জীব পর্য্যায় গণিত হন। ইহাই মায়াবাদের প্রধান সূত্র। **এই জন্যই শঙ্কর মায়াবাদী।** তিনি প্রকৃত ব্রহ্মবাদী নহেন। এই বিচার প্রদর্শনের জন্যই ব্রহ্মসূত্রের 'মায়ামাত্রন্তু' ইত্যাদি সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শঙ্কর এই সূত্রে তাঁহার সমস্ত মতবাদ অর্থাৎ মায়াবাদ-ভাষ্য করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

[ঘ] স্বপ্নের অর্থ মিথ্যা নহে

তিনি আরও বলেন, সৃষ্টি-প্রকরণ মিথ্যা। তাঁহার ভাষায় ভগবদ্ মিথ্যা। এই মিথ্যাত্বের অনুকূলে মায়া শব্দের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিয়া তাঁহার মায়াবাদমূলক মায়া শব্দেরও মিথ্যাই অর্থ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি মিথ্যা বলিয়াই জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া মায়া বা স্বপ্ন একই তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বপ্ন যে প্রকার মিথ্যা অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুর 'অনভিব্যক্ত-স্বরূপতা' নির্ণয় করিতে গিয়া মিথ্যাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মায়াগ্রস্থ জীবেরই যে-স্বপ্নাদি ব্যাপার

তাহা সম্পূর্ণই মিথ্যা। জীব স্বপ্নাবস্থায় দেশ, কাল, রথ, পথাদি যাহা কিছু দর্শন করেন স্বপ্নে তাহার পূর্ণস্বরূপের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপগত অবস্থিতি না থাকায় উহা মিথ্যা অর্থাৎ মায়া মাত্র। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, বদ্ধজীবের প্রকৃত সত্তায় ভগবানের অবস্থিতি নিত্যসত্যরূপে বর্ত্তমান। ভগবৎ সত্তায় জগৎ-সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান থাকায় জীব-হৃদয়ে স্বপ্ন সৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতা স্বভাবতঃ রহিয়াছে। এইজন্য অনেক স্বপ্ন সত্য হইয়া পড়ে। 'সত্যসঙ্কল্পতা' গুণই তাহার প্রধান কারণ। উদাহরণ-স্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের মাতা বিশিষ্টার 'গর্ভে শঙ্কর অবস্থান করিতেছেন' ইহা বিশিষ্টার পিতা মঘমণ্ডন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। এবং সেই স্বপ্ন ধ্রুবসত্যে পরিণত হইয়াছে, ইহা শঙ্করাচার্য্যের কথিত 'মিথ্যা স্বপ্নস্বরূপ' আদৌ প্রমাণিত হয় না। সুতরাং স্বপ্ন মাত্রই মিথ্যা ইহা অযৌক্তিক। এতদ্ব্যাতীত যাহা আত্যন্তিক মিথ্যা তাহা কখনও স্বপ্নে উদিত হয় না। যাহার সত্তা আছে তাহাই জীব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বপ্নে পরিণত হয়। উহা আদৌ আত্যন্তিক মিথ্যা নহে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরের মায়াশক্তি-প্রভাবে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার কখনও শঙ্কর-কথিত স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা নহে; পরন্তু সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

[ঙ] দ্বিবিধ মায়া এবং ছায়া ও প্রতিবিম্ব

মায়াশক্তি-প্রসূত মায়িক জগৎ অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল হইলেও এই জড় জগত মায়াতীত বৈকুণ্ঠ-জগতের ছায়া-সদৃশ প্রতিকৃতি। 'মায়া' বলিতে যোগমায়া ও মহামায়া

উভকেই লক্ষ্য করে। শাস্ত্রে বহুক্ষেত্রে 'মায়া' এই শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। তাহা কোথাও যোগমায়া অর্থে এবং কোথাও বা মহামায়া অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মায়া' শব্দের দ্বারা সর্ব্বত্রই মহামায়াকে লক্ষ্য করিবে, ইহা শাস্ত্রকর্ত্তা বেদ-ব্যাসের বা বেদ-উপনিষদের উদ্দেশ্য নহে। 'যোগমায়া'র ছায়াই 'মহামায়া'। সুতরাং 'কায়া'র প্রতিকৃতি ছায়ায় প্রতিফলিত হয়; ইহা প্রতিবিম্ব-স্বরূপ নহে। 'ছায়া' কায়ার সহিত যুক্তাবস্থায় থাকে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে না। কেবল বৈশিষ্ট্য এই যে, 'কায়া'র স্বরূপ যোগমায়ায় সংযুক্ত থাকিলেও যোগমায়ার পূর্ণ অভিব্যক্তি মহামায়ার স্বরূপ ছায়ায় থাকে না। ইহাই বেদান্ত-দর্শনে "মায়ামাত্রন্তু" সূত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "কাৎ‌স্ন্যেনান-ভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" বাক্যের 'কাৎ‌স্ন্যেন' শব্দের দ্বারা পূর্ণরূপে এবং 'অভি' উপসর্গের দ্বারাও সর্ব্বতোভাবে বুঝাইতেছে। বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলিতে চাই যে, একটি মনুষ্যের ছায়া পতিত হইলে, সেই মনুষ্যের অবয়বের পূর্ণ অভিব্যক্তি ছায়ার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা—চক্ষুর সাদা অংশ এবং বিবিধ সৌন্দর্য্য এবং বৃদ্ধের ন্যায় শ্বেত কেশমালা বা অঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি কিছুই ছায়ায় পরিব্যক্তি হয় না। তথাপি নিকটে গো-মহিষাদির ছায়া পতিত হইলে সেই ছায়ার পার্থক্য মনুষ্যাকৃতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্। তৃতীয় ব্যক্তি ছায়া দর্শন করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে—পূর্ব্বের ছায়া মনুষ্যের এবং পরে উল্লিখিত ছায়া গো-মহিষাদির। ছায়ার দ্বারা

মোটামুটি কাহার ছায়া তাহার অভিজ্ঞান লাভ করা যায়; কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে তাহার বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না। যেমন সাদালোকের ছায়া, না কালো লোকের ছায়া—তাহা বুঝা যায় না। যোগমায়া ও মহামায়ার ইহাই বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য। এইজন্য মহামায়ার জগৎ ও যোগমায়ার জগতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও উহা এক নহে। বর্ত্তমান বিশ্বের ধ্বংসত্ব, পরিবর্ত্তনশীলতা, অনুপাদেয়তা, হেয়তা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠ-জগৎকেও এইরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ও মায়াবাদ-প্রসূত বিচার।

এ-স্থলে মনুষ্য ও পশুর পৃথক্ উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সমবয়স্ক দুইটি মনুষ্যের ছায়া একস্থানে দৃষ্ট হইলে ঐ ছায়াদ্বয় দর্শন করিয়া লোকের পরিচয় পাওয়া সুকঠিন হইলেও মনুষ্যদ্বয় এক নহে—ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে নিবেদন করিতেছি যে, **ছায়া ও প্রতিবিম্ব এক নহে।** আচার্য্য শঙ্কর এই দুইটি পদার্থের ঐক্য ধরিয়া লইয়া বিশ্বের বা জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন নদীতে চন্দ্রের ছায়া পতিত হয় না, কিন্তু প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য্য এই যে, নদীর জল কম্পিত হইয়া তরঙ্গ বা ঢেউ উত্থিত হইলে তাহাতে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবিও কম্পিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে মনে করিতে হইবে না যে, চন্দ্রও তাহার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইতেছে। ইহাই 'ছায়া' ও 'প্রতিবিম্বের' পার্থক্য। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তানুসারে মনুষ্য ও

পশুদ্বয় চলিতে থাকিলে ছায়াও চলিতে থাকে। 'কায়া' স্থির থাকিলে ছায়াও স্থির থাকে। 'কায়া' হাত তুলিলে, মাথা নাড়িলে, ছায়াও হাত তোলে ও মাথা নাড়ে। প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে এইরূপ হয় না। **শঙ্করের 'প্রতিবিম্ববাদ' ও দার্শনিক ক্ষেত্রে 'ছায়াবাদ' এক কথা নহে।**

[চ] ষড়দর্শন ও তন্মধ্যে নাস্তিক্য দর্শন চতুষ্টয়

মায়াবাদিগণ নাস্তিক; ইহাতে নাস্তিকগণ মনে করিতে পারেন, মায়াবাদিগণও আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহা হইলে মায়াবাদীর সৃষ্টিকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্যও নাস্তিক—ইহা বুঝাইতেছে। নাস্তিক্যবাদের বিভিন্ন স্বরূপ বর্ত্তমান যুগে লক্ষ্য করা যায়। আমি এস্থলে 'নাস্তিক' এই শব্দের দ্বারা ভাষাগত অর্থ নিবেদন করিতেছি। সাধারণ জ্ঞানে 'ভাষা' শব্দের দ্বারা কি বুঝায়, তাহার মৌলিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে মানবের মানসিক চিন্তাগত ব্যাপারের যান-বাহনকেই ভাষা বলিয়া থাকে। এই ভাষার তত্ত্বালোচকগণ ভাষার অন্তর্নিহিত চিন্তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করিবার জন্য কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি বহু প্রকার বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন। দর্শনের মধ্যেও ভারতবর্ষে, এমনকি পাশ্চাত্যেও বিভিন্নধারা লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে অস্মদ্দেশীয় দর্শনক্ষেত্রে ছয়টি দর্শন বহু সহস্র বৎসর হইতে প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে। **ছয়টী দর্শন যথা**—কপিলের **'সাংখ্য'**, পতঞ্জলির **'যোগদর্শন'**, গৌতমের **'ন্যায়'**, কণাদের **'বৈশেষিক'**, জৈমিনীর **'পূর্ব্বমীমাংসা'** এবং বেদব্যাসের

'উত্তরমীমাংসা'। ইহাদের মধ্যে বেদব্যাসের উত্তরমীমাংসাকে ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তদর্শন, শারীরক সূত্র প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। **উক্ত দর্শন ষট্‌কের মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক এক চিন্তায় গঠিত এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জল অন্য আর একপ্রকার একই চিন্তায় গঠিত। এই চারিটি দর্শনই নাস্তিক্য দর্শন বলিয়া ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।** চারিটি দর্শন বাদ দিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসাই আস্তিক্য-দর্শনের মধ্যে পরিগণিত। তন্মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসায় আস্তিক্যবাদের সম্বন্ধেই নানা প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হওয়ায় 'ব্রহ্মসূত্রেই' তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। সেইজন্যই বেদব্যাসের এই দর্শনের নাম উত্তরমীমাংসা। সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে আস্তিক্য-দর্শন বলিলে বেদান্ত-দর্শনকেই বুঝায়; অন্যান্য দর্শনগুলিকে আস্তিক্য দর্শন বলা যায় না। প্রথম দর্শন-চতুষ্টয় নাস্তিক্য দর্শন কেন?—তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। ইহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, এমনকি ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান ও পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলিয়া উক্ত দর্শন-চতুষ্টয় আজ পর্য্যন্ত স্বীকার না করায় তাহারা নাস্তিক শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন। **সুতরাং নাস্তিক শব্দে যাহারা বেদ মানেন না এবং ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, অচিন্ত্য শক্তিমান এবং অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহাই নাস্তিকগণের প্রধান লক্ষণ। এমনকি, বেদও তাহারা প্রমাণ বলিয়া মানেন না, অধিকন্তু তাহারা বলেন—বেদও ভ্রান্ত, যেহেতু ঈশ্বর হইতেই জগৎ সৃষ্টি বলিয়াছেন। সুতরাং**

নাস্তিকগণের চিন্তা-ধারার মধ্যে ঈশ্বরের কোন প্রকাশ বা বিকাশ নাই। তাঁহাদের ভাষার মধ্যেও এইরূপ কথা কখন প্রকাশিত হয় নাই।

বৌদ্ধগণ 'বেদ' না মানার দরুণ তাহারা নাস্তিক ও মায়াবাদী-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ভারত-সমাজ বৌদ্ধগণকে নাস্তিক বলিয়া অস্পৃশ্য-জাতির মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাহাদের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখেন না; এমন কি, আহার-বিহার, আদান-প্রদানাদি কোন প্রকার আচারই তাহাদের সহিত করেন না। জৈন-গণও বৌদ্ধদের পদাঙ্কানুসরণ করায় ভারতীয় সমাজ হইতে ছিন্ন হইয়াছেন। মুসলমান ও খৃষ্টানগণের সহিত সেই-প্রকার ভারতীয় সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া, পৃথিবীর সামাজিক গঠনমূলক পরিকল্পনায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছেন। মানুষ যদি চিন্তাধারায় পরম উন্নততম বিষয়ে কাহারও স্বীকৃতি বা অনুমোদন না পায়, তবে তাহাকে দুঃসঙ্গজ্ঞান করিয়া পৃথক্ করিয়া রাখে। দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণই মানব-জীবনের উন্নতির সোপান। এই-জন্যই নাস্তিকগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এক্ষণে মায়াবাদিগণকে কেন সেই নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে, তাহার কৈফিয়ৎ এই প্রবন্ধে দেওয়া আবশ্যক।

[ছ] মায়াবাদী নাস্তিক

অদ্বয়বাদী বৌদ্ধগণ ও অদ্বৈতবাদী শাঙ্করগণ উভয়ই মায়াবাদী, সুতরাং নাস্তিক। নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে জানা যায়—'ন+অস্তি', সন্ধি করিয়া নাস্তি

হইয়াছে। এই 'নাস্তি' শব্দের অর্থ **অস্তিত্বাভাব** অর্থাৎ **অবিদ্যমানতা**। যাহারা 'নাই'—এই বিচারের উপরই ক্রিয়া-কলাপ ও প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষাদি 'দর্শন' নিরূপণ করেন তাহারাই নাস্তিক। 'নাস্তিক' শব্দের উত্তর 'তা' প্রত্যয় করিয়া নাস্তিকতা নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমস্ত অভিধান-কারগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন **—যাহাদের দৃষ্টি 'মিথ্যা' অর্থাৎ সত্য বলিয়া কোন বস্তু যাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না; সর্ব্বদাই 'নেতি' 'নেতি' করিয়া 'ইতি'র কোন সন্ধান যাহারা দিতে পারেন না, তাহারাই নাস্তিক**। শুধু তাহাই নয়, কোন কোন দার্শনিক, যথা—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, জৈন, বৌদ্ধ, আর্য্য-সমাজ, শিখ-সম্প্রদায় প্রভৃতি ইহারা কেহই ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র ও বেদ-উপনিষদের সত্যতা স্বীকার করেন না। ইহারা সকলেই নাস্তিক। ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি।

বৌদ্ধগণ প্রকাশ্যভাবে বেদ এবং তাহার উক্তি অস্বীকার করিয়া নাস্তিক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এমন কি, **'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত অভিধানে** (১৮৫০ শকাব্দে হিতবাদী নৃসিংহাখ্য মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাংলা হরপে মুদ্রিত এবং দেব-নাগরী হিন্দী হরপে কাশী হইতে 'চৌখাম্বা' প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশক-গণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থে) দেখিতে পাওয়া যায়, 'নাস্তিক' ছয় প্রকার; যথা—(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার, (৩) সৌত্রান্তিক, (৪) বৈভাষিক, (৫) চার্ব্বাক, (৬) দিগম্বর—এই ছয় শ্রেণীর দার্শনিকগণ সর্ব্বতোভাবে নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত

হওয়ায় ভারতের নৈষ্ঠিক আস্তিক্য সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই মায়াবাদী।

বৌদ্ধ অমরসিংহ-কৃত 'অমরকোষ', যাহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে, তাহার স্বর্গবর্গে ২২৫ সংখ্যক বাক্যে মুদ্রিত হইয়াছে—**'মিথ্যা-দৃষ্টি নাস্তিকতা'**; অর্থাৎ যাহাদের মিথ্যা দৃষ্টি তাহারাই নাস্তিক। সমস্ত প্রত্যক্ষ বস্তুকেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়াই নাস্তিকতা। এখন বিচার করিয়া দেখুন, মায়াবাদিগণ নাস্তিক কি না? তাঁহারা উচ্চ ধ্বনিতে **'জগৎ মিথ্যা'** প্রতিপন্ন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। সংস্কৃত **'শব্দ-কল্পদ্রুমঃ'** অভিধানে উদ্ধৃত—নাস্তি যজ্ঞফলং, সদসত্ত্বে অস্তি-নাস্তীত্যব্যয়ং, নাস্তি সুকৃতিং, **নাস্তি পরলোকঃ** ইত্যাদি বুদ্ধির্নাস্তিকতা (ইতি ভরতঃ); অর্থাৎ যাহারা পরলোক বিশ্বাস করে না, মুখে বিশ্বাস করিলেও কার্য্যতঃ পরলোকের নিত্য অস্তিত্ব নাই, উহা কাল্পনিক মাত্র ও মিথ্যা—এইরূপ বলিয়া থাকেন। 'নাস্তি' বা নাই এবং মিথ্যা একই কথা। এখন, বহু পাশ্চাত্য দার্শনিক ও এমন কি বাইবেলের চিন্তাধারায়ও পরলোকের স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এইজন্য ভারতীয় পারমার্থিক সমাজ খৃষ্টানগণকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করেন। খাওয়া-দাওয়া, আদান-প্রদান তাঁহাদের সহিত করেন না। মুসলমানগণও এই শ্রেণীভুক্ত।

নাস্তিকগণের অধিকাংশই **ভগবানের আকার নাই, গুণ নাই, শক্তি নাই ইত্যাদি** 'নেতি' 'নেতি' বিচার করিয়া

থাকেন। শাঙ্কর মায়াবাদিগণ ইহার প্রধান অধিনেতা। এইজন্যই মায়াবাদিগণকে আমরা নাস্তিক বলিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। তথাপি ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ শাঙ্কর-মায়াবাদিগণকে বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমানগণের ন্যায় সমাজ-চ্যুত করিয়া অস্পৃশ্য জ্ঞান করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ—আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ঐ নাস্তিক্য বিচার বেদ ও উপনিষদ হইতেই সাধন করিতে অযথা চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকালের জীব অসুরগণের ন্যায় নাস্তিক হইলেই কলিকালোচিত ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে। স্বয়ং শঙ্কর, কলির ধর্ম্ম প্রচারিত হইলেই আসুরিক রাজত্ব বজায় থাকিবে, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার অদ্বৈত-বাদ প্রচার করিয়াছেন। শিব স্বয়ং **পশুপতি** এবং **ভুতনাথ** নামে পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং ভূত-প্রেতের ধর্ম্ম এবং পাশববৃত্তি প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হইলেই শিবের রাজত্ব অটুট থাকিয়া যাইবে। তজ্জন্যই কলিকালে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের প্রবল প্রচার চলিতেছে। ইহা বন্ধ না হইলে কলির ধ্বংস হইয়া সত্য যুগের আবির্ভাব হইবে না—জীবসমূহের শান্তি আসিবে না।

[জ] মায়াবাদের আসুরিক বিচার

আমরা "মায়াবাদের জীবনী"-গ্রন্থের উপসংহারের উপসংহার করিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। যদিও মায়াবাদ-বিচারের উপসংহার অতি সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক নয় এবং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে অধিক কিছু লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগও নাই; তথাপি পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য

তাঁহারা যদি এই সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে চাহেন তবে পৃথক্-ভাবে সাক্ষাতে আলোচনা করা যেতে পারে। বর্ত্তমানে সর্ব্ব-বাদিসম্মত, সর্ব্বজনপূজিত শাস্ত্র-শিরোমণি-স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক এস্থলে আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি করিতেছি। ভারতবর্ষ কেন, ভারতের বহির্ভূত ম্লেচ্ছ পুলিন্দ দেশাদি সকলেই গীতার সম্মান করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ শ্রীবেদব্যাসের পঞ্চমবেদ মহাভারত একলক্ষ শ্লোক-সমন্বিত কাব্যেতিহাস বিশ্বের এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তন্মধ্যে একলক্ষ শ্লোক বর্ত্তমান থাকিলেও, গীতা উহার মধ্যে অপূর্ব্ব; এবং ইহাতে সংক্ষেপতঃ সাধারণ জীবের পক্ষে সমগ্র বেদ, উপনিষদ, মহাভারতাদির শিক্ষার সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এবিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই।

আজকাল আসুরিক জগতে ধার্ম্মিক সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসুরিক ধর্ম্ম-প্রচারার্থ অনেককে বিবেকহীনের ন্যায় গীতার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কটূক্তি করিয়া বিশ্বে বিচরণ করিতে দেখা যায়। আমরা এইরূপ মত প্রচারকারীকে ধর্ম্মধ্বজী, প্রতারক ও হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংসকারী বলিয়া মনে করি। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারাই আসুরিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। আপনাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, সন্ন্যাসিবেষ হইলেই আমাদের পক্ষে আদর্শ নহে; ইহার উজ্জ্বলতম উদাহরণ—রাবণ সন্ন্যাস-বেষ-গ্রহণপূর্ব্বক সীতা হরণ করিতে গিয়াছিল। রাবণের সন্ন্যাস—আসুরিক সন্ন্যাস। শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। অসুরগণের প্রবৃত্তি

—মূলবস্তু হইতে শক্তিকে অপহরণ করা। ভগবান্ নিঃশক্তিক থাকুন,—ইহাই অসুরগণের চেষ্টা। মায়াবাদ-দর্শনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম কেবল যে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ তাহাই নহে, তিনি নিঃশক্তিকও বটেন; তাহাকে নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, আমরা ব্রহ্মের উপর যথেচ্ছাচারিতা চালাইতে পারিব—ইহাই আসুরিক ধর্ম্ম।

এই জন্য গীতার ষোড়শ অধ্যায় পঞ্চম শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের শিক্ষার জন্য অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥

[দৈবী সম্পদ্ মোক্ষানুকূল এবং আসুরী সম্পদ্ সংসার-বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী-সম্পদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোক করিও না]।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—আসুরিক সম্পদ্ বন্ধনদশায় বিশেষ ক্লেশকর। জীবমাত্রই শান্তির অভিলাষ করিয়া থাকে; কিন্তু আসুরিক সম্পদ্ দুঃখ আনয়ন করে। সুতরাং তাহাতে কাহারও অভিসন্ধি থাকা উচিত নহে। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি উচ্চ-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত অসুরগণের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতিয়মান হয় যে, আসুরিক রীতি-নীতি-ধর্ম্ম অত্যন্ত ক্লেশকর এবং শুধু তাহাই নহে, ইহা অত্যন্ত অধঃপতিত জীবনের

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রের মধ্য দিয়া জীবের কল্যাণ কামনা করিয়া, কোন্ কোন্ মতবাদিগণ এবং কোন্ কোন্ তথাকথিত ধার্ম্মিক-নামধারিগণ আসুরিক, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না করিলে কলিহত জীবের কোন মঙ্গল হইবে না। এইজন্য গীতা-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥

সুতরাং গীতাই সর্ব্বতোভাবে গীত হওয়া কর্ত্তব্য—অন্য শাস্ত্র-বিস্তারের কি প্রয়োজন? যেহেতু পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা-শাস্ত্রের স্বয়ং বক্তাস্বরূপ। যেস্থলে স্বয়ং কৃষ্ণ বক্তাস্বরূপে শিক্ষা দিতেছেন সেখানে আমরা নিশ্চিন্ত-মনে তাহা গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের যাঁহার ধামে যাইতে হইবে এবং যাঁহার নিকট গিয়া শান্তিলাভ করিতে হইবে, তিনি স্বয়ং বক্তা হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? সুতরাং গীতোপ-নিষদের শিক্ষা অবলম্বন করিয়াই আমরা ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হইব; নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের কঠোর শুষ্ক বিষময় শিক্ষা গ্রহণ করিব না। বেদব্যাসের বেদান্ত-দর্শনও আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছেন। ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে পরাৎপরমুক্তি কখনও লাভ হয় না। শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিয়াছেন—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (ভাঃ ১০।২।৩২)

অর্থাৎ কৃচ্ছ্র জ্ঞান-সাধনের দ্বারা পরমপদ পর্য্যন্ত লাভ করিলেও "ভগবান্ নাই, ভগবান্ নিঃশক্তিক, ভগবান্ নিরাকার, ভগবান্ মায়াগ্রস্ত বা অবিদ্যাগ্রস্ত" প্রভৃতি বিচারপরায়ণ হইয়া ভগবানের অনাদর করিলে অধঃপতিত হইতে হয়।

শ্রীগীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে বলিতেছেন—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব **আসুর** এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত **আসুরং** পার্থ মে শৃণু॥
(গীতা ১৬।৬)

হে অর্জ্জুন, ইহ সংসারে অর্থাৎ আমার সৃষ্ট জগতে দৈব এবং আসুর—দুই প্রকার জীব সৃষ্ট হইয়াছে। আমি দৈব সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছি; এক্ষণে অসুর-প্রকৃতি মনুষ্যের সম্বন্ধে আমার নিকট শ্রবণ কর। ইহার অনুরূপ, এমন কি একই বাক্য পদ্মপুরাণেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; কেবলমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে সামান্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব **আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ**॥

শাস্ত্রের একই উক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইতেছে। গীতা হইতে পদ্মপুরাণের বৈশিষ্ট্য এই যে—গীতার স্পষ্ট কথাও পদ্মপুরাণে অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। এখন বিবেচনা করা আবশ্যক এই যে, মায়াবাদিগণ ইহার কোন্ কোন্ উক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেছেন—যাহা হইতে আমরা

তাহাদিগকে 'অসুর' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

"বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

কেবল বিষ্ণুভক্তগণই দেবতা এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয় তাহারাই অসুর-শ্রেণীভুক্ত; ইহা সমস্ত শাস্ত্রাদিতে পরিলক্ষিত হইতেছে। রাবণ রাক্ষস এবং প্রধান অসুর বলিয়া জগতে সুবিদিত। তাহার রাজপ্রাসাদে তিনি স্বয়ংই চামুণ্ডা বা দুর্গাদেবীর পূজা করিতেন। কিন্তু সশক্তিক বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করা দূরে থাকুক, তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া জগৎকে কুশিক্ষা দিয়াছিল—মূল পরব্রহ্ম, পরমাত্মা রামচন্দ্রের কোন শক্তি থাকা উচিত নহে—তাঁহাকে নিঃশক্তিক রাখিতে হইবে; ইহাই অদ্বৈতবাদী—মায়াবাদিগণের প্রধান বিচার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া ইহা সমগ্র জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন—মায়াবাদিগণ অসুরশ্রেণীভুক্ত। তাঁহার গৃহদেবতা দুর্গাদেবীর উপাসনা করিলেও সেই দুর্গাদেবী রাবণকে রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং করেনও নাই; বরং রাবণ-বিনাশের সহায়ক হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু—ইহা লোকপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং তিনি দশাবতার-স্তোত্রে বিষ্ণুর সপ্তম অবতাররূপে বহু শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। মায়াবাদী অসুরগণ সকলেই বিষ্ণুবিরোধী। পদ্মপুরাণ যেমন পরিষ্কার ভাষায় মায়াবাদীর স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, গীতা তদপেক্ষা আরও সূক্ষ্মতম বিচার প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদ-ধর্ম্ম

যে আসুরিক, তাহা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। **গীতার ষোড়শ অধ্যায় ৮ম শ্লোকে মায়াবাদী অসুরগণের এবং নাস্তিক-গণের পূর্ণ স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে ; যথা—**

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥

অর্থাৎ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ জগতকে **'অসত্য'** ও 'অনীশ্বর' বলেন ; ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা বলিয়া কেহ নাই। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর কামজনিত সংযোগেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, অদ্বৈত-বাদী মায়াবাদিগণের প্রধান সিদ্ধান্ত—**'জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা'। যাহারা জগৎ মিথ্যা, অসত্য, অলীক, স্বপ্নবৎ বলিবে, তাহারাই অসুর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং বেদব্যাসের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং উক্তির দ্বারা মায়াবাদিগণ অসুর ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।** চার্ব্বাক্ প্রভৃতি 'লোকায়তিক' মতেও জগতের কোন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, পরকাল বলিয়া কোন কাল বা জগৎ নাই—ইহ জগৎই যথাসর্ব্বস্ব ; তাহার বিচারও,—

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।"

অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া আছ চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনাদি করিয়া সুখে থাকাই কর্ত্তব্য। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?' মানুষ মরিয়া গেলে পুনরায় আগমনের সম্ভাবনা নাই ; ঋণ করিলেও পরিশোধ করিতে হইবে না।

গীতার উক্ত শ্লোকের 'অসত্যং' বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষণে অন্য প্রত্যেকটি শব্দ লইয়াই মায়াবাদিগণের বিচারের মিলন দেখান যাইতে পারে। মায়াবাদিগণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। যিনি এইরূপ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিয়া থাকেন তিনি নিঃশক্তিক, অবিদ্যাগ্রস্ত মায়িক জীব পর্য্যায়ভুক্ত। এইজন্য আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের বিবিধ শ্রেণী নিরূপণ করিয়াছেন। **'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম'** তিনি নির্ব্বিশেষ; কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্ম মায়াবদ্ধ অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন; ইনিও জীব-পর্য্যায়মধ্যে পরিগণিত। কোথাও কোথাও অদ্বৈতবাদিগণ দয়া করিয়া ইহাকে ঈশ্বর ব্রহ্ম সংজ্ঞা দিয়াছেন। ইনি ব্রহ্মের বিরাট অংশ মায়া বা অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া ঈশ্বর আখ্যা লাভ করিয়াছেন। আর জীব বলিতে কিছুই নাই। জীব-শব্দ নিরর্থক ও মিথ্যা; অবিদ্যাগ্রস্ত ব্রহ্মের ক্ষুদ্রতম অংশকে জীব বলা হয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে জীব মিথ্যা। এস্থলে 'সিদ্ধান্ত-রত্নমালা'র কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিতেছি—

অদ্বৈতবাদদূষণম্

অদ্বৈতবাদিনাং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং বিকল্পিতম্।
ব্রহ্ম তু ব্রহ্মসূত্রস্য সৃষ্টি-স্থিত্যাদি-কারণম্ ॥ ১ ॥
দৃষ্টৈবং নির্ম্মিতং বাক্যং মুখ্যং গৌণমিতিদ্বয়ম্।
ব্রহ্মণো লক্ষণে ভেদো জ্ঞানিনাং শোভতে কথম্ ॥ ২ ॥

'জন্মাদ্যস্য যতো' বাক্যে ব্রহ্ম সশক্তিকং ভবেৎ।
ক্লীবেন শক্তিহীনেন সৃষ্ট্যাদি সাধ্যতে কথম্ ॥ ৩ ॥
শক্তিনাং পরিহারে তু প্রত্যক্ষাদি প্রবাধতে।
শাস্ত্রযুক্ত্যা বিনা বস্তু নাস্তিকেনাদৃতং হি তৎ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া বিশেষরূপে কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি ক্রিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অথচ ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রের দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়াদির কারণরূপে ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম যদি সৃষ্টি-স্থিতি আদির কারণ হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। বেদ-বেদান্তে এই প্রকার বাক্য বা বিচার নির্ণীত হইয়াছে দেখিয়া 'মুখ্য' ও 'গৌণ' এই দুই প্রকার ব্রহ্মের লক্ষণে ভেদসৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ইহা জ্ঞানিগণের পক্ষে কি-প্রকারে শোভা পাইতে পারে? 'অদ্বৈত' বলিতে দ্বিতীয়রহিত, সেখানে ব্রহ্মের দ্বিবিধতা আদৌ শোভা পায় না। তাহা ছাড়া 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই বেদান্তের বাক্যে ব্রহ্ম জন্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া পড়েন; অতএব তিনি সশক্তিক, নিঃশক্তিক ব্রহ্ম কোন প্রকারেই প্রতিপন্ন হন না। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হইলে তিনি ক্লীব হইবেন। ক্লীব ব্রহ্মের অর্থাৎ শক্তিহীনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি ক্রিয়া কি-প্রকারে সম্পন্ন হইবে? শক্তি পরিহার করিলে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বাধা হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষভাবে শক্তির ক্রিয়া দর্শন-অনুভবাদি

হইয়া থাকে ; সুতরাং শাস্ত্রযুক্তি ব্যতীত বস্তু নাস্তিক অসুর-গণের দ্বারা আদৃত হইতে পারে। কিন্তু মঙ্গলকামী দৈব-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের নিকট অদ্বৈতবাদিগণের আদরের বস্তু কখনও আদৃত বা স্বীকৃত হইতে পারে না।

এমন কি, উক্ত **'সিদ্ধান্ত-রত্নমাল'** গ্রন্থের 'সাংখ্য-মতদূষণম্'-শিরোনামায় নিম্ন শ্লোক দুইটি আলোচনা করিলে আসুরিক চিন্তার আরও পরিচয় পাওয়া যাইবে—

সাংখ্যমতদূষণম্

কেচিদাহুঃ প্রকৃত্যৈব বিশ্বসৃষ্টির্ব্যবস্থিতা।
তেষাং বৈ পুরুষঃ ক্লীবঃ কলত্রং হি তথৈব চ ॥ ১ ॥
পত্যভাবে কুমারীণাং সন্ততির্যদি দৃশ্যতে।
তেষাং মতে প্রশংসার্হা সমাজে সা বিবর্জ্জিতা ॥ ২ ॥

নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিলমুনি বলিতে চাহেন—বিশ্বের সৃষ্টি-কার্য্যে ঈশ্বরের কোন আবশ্যকতা নাই। প্রকৃতিই সৃষ্টি-কর্ত্রীরূপে জগৎ প্রসব করিতেছেন ; ইহাতে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। যদি কেহ ঈশ্বর বা পুরুষের কথা স্বীকার করিতে চাহেন তাহা হইলেও সে পুরুষ ক্লীব। তাহাদের মতে— ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব না থাকায় পুরুষ ক্লীব। কিন্তু আমরা বলিতেছি, পুরুষকে যদি ক্লীব বলা হয়, তবে প্রকৃতি বা কলত্রও ক্লীব।

বৈয়াকরণিকগণ সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্থির করিয়াছেন **'কলত্র'** শব্দ ক্লীব লিঙ্গ **অর্থাৎ** স্ত্রী-পুরুষলিঙ্গ-বহির্ভূত নিঃশক্তিক।

কিন্তু পুরুষকে কোথাও ক্লীব বলা হয় নাই। পরন্তু পুরুষ-বিহীন নারীর সন্তানাদি অসম্ভব। পুরুষের সঙ্গবিহীন নারীর সন্তানাদি সম্ভব নহে অর্থাৎ কেবল নারী প্রসব করিতে পারে না। এক্ষণে পুরুষবিহীন প্রকৃতি যদি সৃষ্টিকর্ত্রী হয় তাহা হইলে সে প্রকৃতিও ক্লীবস্বরূপ বা হেয়। উদাহরণ-স্বরূপ— পতি-অভাবে কুমারীগণের সন্তান-সন্ততি যদি দেখা যায়, তাহা সাংখ্যকারগণের মতে প্রশংসার্হ হইতে পারে; কিন্তু ধার্ম্মিক সমাজে সেই কুমারী অসতী বলিয়া বিবর্জ্জিতা হইবে। কারণ পতিবিহীন কুমারীর সন্তান পরিলক্ষিত হইলে সেই কুমারীকে সমাজ অসতী নারী বলিয়া ঘৃণা করিবে। সুতরাং সাংখ্য-মতে এই প্রকার প্রকৃতিবাদ ধার্ম্মিক সমাজে হেয়, বর্জ্জিত এবং ঘৃণিত।

গৌতম ও কণাদের ন্যায়ও বৈশেষিক-দর্শনও নাস্তিক্য-দর্শন। তাঁহারা কেহই ঈশ্বরের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই; এমন কি বেদও তাঁহাদের দর্শনে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তজ্জন্য 'সিদ্ধান্ত-রত্নমালা' গ্রন্থে তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—

ন্যায়মতদূষণম্

জড়াণুমিলনে সৃষ্টিঃ জীববিশ্বাদিকং কিল।
স্থিতিস্তেষাং প্রমাসিদ্ধা পরিবর্ত্তনমূলকা॥ ১॥

ধ্বংসস্তু কালচক্রেণ পরমাণু-বিভাজনে।
স্বভাবৈর্ঘটিতং সর্ব্বং কিমীশস্য প্রয়োজনম্॥ ২॥

ঘট-পট-গুণজ্ঞানে জড়দ্রব্য-বিচারণে।
তার্কিকানাং মহামোক্ষমন্যায়েন কথং ভবেৎ ॥ ৩ ॥
'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।
ইতি ন্যায়াৎ পদার্থত্বং প্রাপ্নোতি নাস্তিকঃ সদা ॥ ৪ ॥
অসৎকারণবাদে হি স্বীকৃতাঽভাব-সংস্থিতিঃ।
সত্তাহীনস্য সত্তা তু যুক্তিহীনা ভবেৎ সদা ॥ ৫ ॥
কার্য্যকারণয়োরীত্যা জড়ান্ন চেতনোদ্ভবঃ।
গীতাবাক্যং সদামান্যং 'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' ॥ ৬ ॥

নৈয়ায়িক গৌতম ও কণাদ বলেন—জীব এবং বিশ্বাদির সৃষ্টি জড় অণু-পরমাণুর মিলনেই হইয়াছে; ইহাতে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। এই সৃষ্টি পরিবর্ত্তনশীল, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সিদ্ধ। কালপ্রভাবে এই বিশ্ব কালচক্রে ধ্বংস-মুখে পতিত হইয়া থাকে। ইহার মূল কারণ যে পরমাণু সংযোগ, সেই পরমাণুর বিভাগ ঘটিলেই বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য্য। ইহাতে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা কি? ঘট-পট-গুণদ্রব্যের জ্ঞানে এবং জড়দ্রব্যের বিচারণে তার্কিকগণের মহামোক্ষ অন্যায়রূপে কি-প্রকারে সম্ভব হয়? ন্যায়-দর্শন নামে অন্যায় বিচার দ্বারা কখনও যুক্তি-সিদ্ধ সুফল ফলিবে না। তাহার কারণ 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' অর্থাৎ যে যেরূপ ভাবনা করে তাহার সেইরূপ সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই ন্যায়ানুসারে পরমাণুবাদী নাস্তিকগণ জড়পদার্থতা প্রাপ্ত হইবেন। ঘট-পট জড় অণু-পরমাণুর চিন্তাতে সেই জড়ত্বই লাভ হয় মাত্র। প্রকৃত-

প্রস্তাবে বাস্তবমোক্ষ সুদূর-পরাহত। সাধারণ যুক্তি-তর্কের বিচারে কার্য্য-কারণ রীতি-অনুসারে দেখিতে গেলে অসৎ-কারণ-বাদিগণের অসৎ বস্তুর সংস্থিতি স্বীকৃত হয় কিরূপে? অর্থাৎ সত্তাহীন বস্তুর সত্তা নিতান্ত যুক্তিহীন হইয়া থাকে। গীতাশাস্ত্র কার্য্যকারণ-রীতি-অনুসারে জড়বস্তু হইতে কখন চেতনের উদ্ভব সম্ভব হয় না বলিয়াছেন। তজ্জন্য গীতা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' অর্থাৎ অভাব জাতীয় বস্তুর বিদ্যামানতা কখনও স্বীকৃত হয় না। সুতরাং ন্যায়-দর্শনের বিচারকে গীতাশাস্ত্র স্বয়ং আসুরিক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত ১৬শ অধ্যায়, ৮ম শ্লোকের 'জগদাহুরনীশ্বরং' বাক্য হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত 'অপরস্পরসম্ভূতং' বা স্বভাব হইতে জাত, ইহাতে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া বিচার করাই আসুরিক জ্ঞান। উক্ত 'সিদ্ধান্ত-রত্নমালা' হইতে উদ্ধৃত দ্বাদশ শ্লোকে নাস্তিক্য-দর্শনের দ্বারা আসুরিক বিচারের এই অর্থ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

[ঝ] সংক্ষেপতঃ মায়াবাদের অসারতা

আচার্য্য শঙ্করের প্রচারিত দর্শনকে আমরা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত, মায়াবাদ এবং অসৎ-শাস্ত্র, সর্ব্বশেষ আসুরিক শিক্ষা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি; অর্থাৎ শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদের বিচারধারা যে নাস্তিক্যবাদে পরিপূর্ণ, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। বেদব্যাস স্বয়ং পদ্মপুরাণ ও গীতাশাস্ত্রে স্পষ্টরূপে **শাঙ্কর-দর্শনকে প্রচ্ছন্ন-**

বৌদ্ধ, অসৎশাস্ত্র এবং **আসুরিক** বলিয়া জানাইয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের ৯ম পৃষ্ঠায় পদ্মপুরাণে বর্ণিত "মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে" শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি। গ্রন্থের ১২শ পৃষ্ঠায় স্বয়ং শঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—"আমি ব্রাহ্মণ রূপে কলিকালে আবির্ভূত হইয়া অবৈদিক শাস্ত্র প্রচার করিব।" আমি এই উক্তির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "মায়াবাদের জীবনীর" ১৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আসুরিক ধর্ম্মের বিষয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গীতা-শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ 'জগৎ অসত্য—মিথ্যা' এবং 'জগতের কোন ঈশ্বর নাই'—এই বিচার যাহাদের, তাহারা আসুরিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশে নাস্তিক ও অসুর—এই দুইটী শব্দ গালাগালিরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে উক্ত শব্দদ্বয়কে কঠোর গালাগালি বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমি তথাপি উক্তরূপ কঠোর উক্তি করিতেও কোন-রূপ দ্বিধাবোধ করি নাই। কারণ ধর্ম্মের নাম করিয়া দার্শনিক জগৎ যে উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। কলিকালের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ; আমি কলির হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষার জন্য, প্রকৃত-পন্থা কোনরূপ গোপন না করিয়া, প্রকাশ্যভাবে উহা ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাই, তাঁহারা অদ্বৈতবাদী ; ইহার মূল কারণ—সংস্কৃত-শিক্ষা-মন্দিরে, স্কুল-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে

অনেকেই নাস্তিক আসুরিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতবাদ যে যুক্তিহীন এবং শাস্ত্র-প্রমাণহীন, ইহা তাঁহাদের জানা একান্ত আবশ্যক। কোন কোনক্ষেত্রে তাঁহারা ইহা জানিয়াও স্বমত-পোষণে ও রক্ষণে ব্যস্ত হন।

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত-দর্শনের যেরূপ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য করিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব অসঙ্গত এবং যুক্তিহীন। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-বাক্যের তিনি যাহা অর্থ করিয়াছেন, তাহা আদৌ সঙ্গত হয় নাই। 'অদ্বৈতং'-শব্দের অর্থ—দুই-রহিত নহে, পরন্তু দ্বিতীয় রহিত অর্থাৎ অসমোর্দ্ধ ঈশ্বরই এক শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। 'এক' বলিতে নির্ব্বিশেষ গাণিতিক '১'—এক নহে, উহা শূন্যের প্রতীক। বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ ইহা সমস্তই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রযুক্তির সীমা না পাইলে 'নেতি' 'নেতি' করিয়া সব উড়াইয়া দিবার অপচেষ্টা হইয়া থাকে। অজ্ঞ জ্ঞানহীন শিশুগণই 'না' 'না' বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিয়া থাকে। বালকের রোদনে 'না' 'না' থাকিলেও সমস্তই নাস্তিকতায় পরিণত হইবে না; পিতামাতা শিশুকে প্রবোধ দিয়া সৎশিক্ষা দিয়া থাকেন। বেদ-উপনিষদ, মহাভারতাদি শাস্ত্রসমূহের পরিভাষার গম্ভীর তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলেই নানাপ্রকার শব্দবৃত্তির উপর খামখেয়ালী ও অবিচার আসিয়া পড়ে। ইহাকেই 'লক্ষণা' বলে। শব্দের অভিধাবৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক লক্ষণার আনুগত্য করাই নাস্তিকতা। আচার্য্য শঙ্কর নাস্তিক্যবাদরূপ লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্মবাদ স্থাপনের অযথা প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু অভিধাবৃত্তিতে ব্রহ্ম পূর্ণ,

সাবয়ব, সশক্তিক ও সবিশেষ তত্ত্ব। তাহা স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম ও নিরতিশয় বৃহত্ত্বযুক্ত। **যাহা হইতে ইহ জগতের জন্মাদি হইয়াছে—'জন্মাদ্যস্য যতঃ'** (বেদান্তদর্শন ১।১।২), 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি উপনিষৎ তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ বলেন—**"সর্ব্বত্রবৃহত্ত্ব-গুণ-যোগেন ...... মুখ্যবৃত্তঃ** (শ্রীভাষ্য ১।১।১)। সুতরাং পরমেশ্বরই **শাস্ত্র ও** বৈষ্ণবগণের আদৃত ব্রহ্ম এবং এই 'ব্রহ্ম' আচার্য্য শঙ্কর-কথিত 'ব্রহ্ম' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।—

বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং
শ্রীচৈতন্যাত্মাং বিশ্বযোনিং মহান্তম্।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গের বেদ-উপনিষদাদি এবং বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা সর্ব্বদা আলোচনীয়। দেশে সৎশিক্ষা প্রচলন করিতে হইলে শ্রীমধ্ব, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য প্রভৃতির, সর্ব্বোপরি শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর "গোবিন্দ-ভাষ্যের" প্রচার ও আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক।